সপ্তর্ষি

২১ বর্ষ, অক্টোবর, ২০১৫
শারদ সংখ্যা - ১৪২২

সম্পাদক- তরুণকুমার সরখেল

পুরুলিয়া শহর থেকে প্রকাশিত একমাত্র ছোটদের পত্রিকা

ছোটদের পূজাবার্ষিকী ১৪২২ | ২১ বর্ষ, অক্টোবর ২০১৫

সম্পাদক

তরুণকুমার সরখেল

মুক্তাঙ্গন
উত্তর আমডিহা, ডাক- দুলমি নডিহা
জেলা- পুরুলিয়া, ৭২৩১০২

e-mail:
sarkheltarun126@gmail.com

মোবাইল নং ঃ ৮৫৩৭৯০১২৪০

অলংকরণ

অবি সরকার ও প্রণব হোড়

মুদ্রণ সহযোগিতায়

রাজেশ রেওয়ানী

বাবা লোকনাথ কম্পিউটার অ্যান্ড অফসেট প্রিন্টিং মঠ
বি টি সরকার রোড, পুরুলিয়া
(৯৪৭৫৩২৪৪৭৪)

মূল্যঃ ২৫ টাকা

ছোট্ট বন্ধুরা,
আবার এক বছর পর তোমাদের
জন্য পুজো সংখ্যা নিয়ে হাজির হলাম।
এবার তোমাদের জন্য থাকল
একডজন গল্প ।সঙ্গে কমিক্স,
ছড়া-কবিতা-লিমেরিক,
খেলা সহ অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।
পুজোর ছুটিতে পড়ে ফেলো
আর কেমন লাগল তা
আমাদের জানিয়ে দিও।
পুজোর ছুটিতে কে কোথায় বেড়াতে
গিয়েছিলে সে বিষয়ে
আমাদের জানাতে পারো।
আগামী সংখ্যাতে তোমাদের
বেড়ানোর গল্প
গুলো ছাপা হয়ে বের হলে
সঞ্চিতার সমস্ত
ছোট বন্ধুরা সেগুলো
পড়তে পারবে।
পুজোর দিনগুলো
তোমাদের ভালো
কাটুক, আনন্দে
কাটুক, হৈ-চৈ করে
কাটুক এই আশা রাখি।
বন্যার কারণে যারা
পুজোর আনন্দে মেতে
উঠতে পারলে না তাদের
সঙ্গে আমরা দুঃখ
ভাগ করে নিতে চাই।
মা আনন্দময়ীর
অশেষ কৃপা
ঝরে পড়ুক
তাদের উপর
এই কামনা করি।
সবাই ভালো থেকো।

ছোটদের পাতা
✷ প্রবাহনীল দাস সোহিনী নন্দী অনমিত্র দেওঘরিয়া সন্দীপকুমার মাহাত তনুব্রত সরখেল দেবার্পণ ঘোষ -১৮।

ছড়া ও কবিতা
✷ভবানীপ্রসাদ মজুমদার - ৫, অপূর্ব দত্ত সুখেন্দু মজুমদার জয়নাল আবেদিন অপূর্বকুমার কুন্ডু দীপ মুখোপাধ্যায় -৬, রূপক চট্টরাজ সুনীতি মুখোপাধ্যায় পবিত্র সরকার - ৭, বিষ্ণু সামন্ত সতীরঞ্জন আদক সুজিতকুমার পাত্র তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় উৎপলকুমার ধারা বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় -৮, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত - ১৭।

কমিক্স
✷ কুমার হোড় - ৪, প্রণব হোড় - ৩৮।

সত্যজিত রায়ের অসমাপ্ত গল্প - ১০।

গল্প
✷ সুনির্মল চক্রবর্তী -১৫, অবি সরকার -১৯, অনন্যা দাশ - ২২, মধুসূদন ঘাটী- ২৮, সমাজ বসু - ৩০, প্রণব হোড় -৩১, জন পূততুণ্ড- ৩৩, সুচিত চক্রবর্তী - ৩৫, অমিতাভ শঙ্কর রায়চৌধুরী - ৩৬।

লিমেরিক
✷মহাবীর নন্দী তাপস পাল নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী নীতীশ চৌধুরী -২৬।

ছড়া ও কবিতা
✷অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্চারী ব্যানার্জী শীতল চট্টোপাধ্যায় সতীশ বিশ্বাস - ২৭, গোপাল কুম্ভকার তপন দাস দিগম্বর দাশগুপ্ত নিতাইচন্দ্র রজক -৩৮, বিকাশচন্দ্র দাস কাজী শাহাদাত আলী সুকান্ত ঘোষ শ্যামাচরণ কর্মকার সুদর্শন মাজি -৩৯, অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী নূপুর সরখেল অংশুমান চক্রবর্তী বসুন্ধরা মাজি সুভাষ মুখোপাধ্যায় -৪০, সলিল মিত্র স্বপনকুমার বিজলী রামচন্দ্র ধাড়া সোমনাথ নন্দী ত্রিদিব ঘোষ রায় শিশির সাঁতরা -৪১, শীলা মুখোপাধ্যায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ বিধান সাহা তারাশংকর চক্রবর্তী কাজল কুশারী-৪২ দেবাশিস দন্ড বিকাশ পন্ডিত নয়নতারা তন্তুবায় বাপ্পাদিত্য পান্ডে - ৪৩।

খেলার পাতা
✷অমল ত্রিবেদী -৫২।

বাংলাদেশের ছড়া ও কবিতা
✷নীহার মোশারফ জসীম মেহবুব অরুণ শীল - ৯।

ছড়া ও কবিতা
* প্রবীর জানা অসীম আচার্য রমেন রায় রাজকুমার সরকার জগদীশ মন্ডল অলক দাঁ -৪৪।

গল্প
*সৌম্যনারায়ণ আচার্য -৪৫, মনোরঞ্জন গরাই - ৬০।

পুরাণের গল্প *দেবদুলাল কুন্ডু - ৫৪, **মহাভারতের আদি পর্বের কাহিনি** *শীলা সরকার - ৫৮।

ছড়া ও কবিতা
*সুচন্দ্রনাথ দাস গদাধর সরকার পার্থ সিনহা সমরকুমার চট্টোপাধ্যায় -৪৭, স্মরজিৎ বিশ্বাস স্নেহাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায় অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুমিতকুমার বেরা রণজিৎ হালদার তপনকুমার দাস -৪৮, শুভজিৎ বরকন্দাজ মোহাম্মদ আলী বুলবুল অশেষকুমার ভট্টাচার্য গোপালচন্দ্র মাজি তারক চট্টোপাধ্যায় স্বপন বসু মল্লিক -৪৯, ষষ্ঠীপদ পাল রাজীব মিত্র মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী সন্তোষকুমার রায় -৫০, সুদীপ্ত বিশ্বাস পুতুল ভট্টাচার্য চৈতালি মজুমদার সুশান্ত তেওয়ারী মদন চক্রবর্তী - ৫১।

জীবজগতের গল্প
*তাপস চক্রবর্তী -৫৫।

গবুর কান্ড
*কুমার হোড় চৌধুরী -৫৩ ও ৬৭।

ছড়া ও কবিতা
*কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্র সরখেল মানস সরকার গোবিন্দ মোদক -৫৬, দুর্গাদাস পাল প্রদীপকুমার সামন্ত অপর্ণা দেওঘরিয়া জ্যোৎস্না হালদার মানস দরিপা অখিল চট্টোপাধ্যায় -৫৭।

ছড়া ও কবিতা
*কাজল দাস পরিমল ঘোষ -৫৯, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায় লালমোহন ভট্টাচার্য সুযশকান্তি দত্ত-৬১, সোমনাথ ভট্টাচার্য নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত শশাঙ্কশেখর মৃধা সুধারানি মৃধা পবিত্র চট্টোপাধ্যায় - ৬২, পঞ্চানন বসু মল্লিক কাঞ্চনকুমার মুখোপাধ্যায় অরুণ মন্ডল সৌমিত্র মজুমদার সুদীপ্ত সরখেল গৌর সেন -৬৩, সত্যজিৎ দাস উদয়ন হাজরা কনক ঠাকুর নীলাদ্রিশেখর সরকার বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস কল্যাণ দাশগুপ্ত নীলাকাশ বসু - ৬৪।

দক্ষিণ আফ্রিকার লোককথা
*সৈয়দ রেজাউল করিম -৬৫।

ভালো ভূতের গল্প
*তরুণকুমার সরখেল - ৬৯।

ছোটদের বই -৭১ ও ৭২।

পুটু
পুজোর ছুটি। ভাবছি সিনেমা যাব। পুটু পা না টিপে চটপট নুন শো'র একটা টিকিট নিয়ে আয় তো দেখি-
কিছু পর
ইস্কিরি- কর্তাবাবু নুন শো হাউস ফুল।
তাহলে ম্যাটিনি শো আন।
কিছু পর
কর্তাবাবু- ম্যাটিনিও হাউস ফুল।
তাহলে ইভনিং শো -
কিছু পর
ইভনিং টাও হাউসফুল।
যা: বাব্বা:!
তাহলে নাইট শো'র টিকিট নিয়ে আয়।
কিছু পর
কর্তাবাবু - নাইট শোও দেখি হাউসফুল।
ধুত্তোর! নিকুচি করেছে -
কি এমন ছবি যে সব শো হাউস ফুল। চ' গিয়ে দেখি
উফ্ হাতে লাগছে।
তখনি বলছি সব শো হাউসফুল। মিছে আমি কই না কর্তাবাবু।
হাউসফুল
টিকিট ঘর
হাউস ফুল
দুপুর - মধ্যাহ্ন - বৈকালিক - রাত্র
অদ্য চলিতে হাউস অভিনয়
তা'লে মিছে মিছে আমি সব টিকিট নিয়ে বসে কেন ? 'হাউস ফুল' তো ছবির নাম !
HORE

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

দুর্গাদেবী কাহিল হেভী

মর্ত্যে এসেই দুর্গাদেবীর হলো ভীষণ জ্বর
সঙ্গে সারা গায়ে ব্যথা, আর বুক ধড়ফড় !
দুর্বলতা, গা-বমি ভাব, কেবল মাথা ঘোরে
গাঁটে-গাঁটে কী যন্ত্রণা, জ্বরেতে গা পোড়ে !

গণেশ বলে, ডেঙ্গু নাকি, নাকি এনকেফেলিস ?
কার্তিক বললে, ইংলিশ তুই সত্যি গুলে খেলিস !
লক্ষ্মী বললে, ম্যালেরিয়া ! নয় জন্ডিস, কামলা
কিন্তু মায়ের উপর কেন করল ওরা হামলা ?

রক্তের টেস্ট করানোই বেস্ট ট্রপিক্যালে কাল গিয়ে
সরস্বতী বললে, মা-কে আমিই যাবো নিয়ে !
ছদ্মবেশেই যাবো আমরা, নেই চিন্তার কারণ
এই জন্যেই বাবা এখানে আসতে করেন বারণ !

এখন বাবা শুনলে দেবেন আমাদেরকেই দোষ
লক্ষ্মী বললে, এখন কী লাভ করে এতো আপশোশ !
হবার যা, তা হবেই হবে, আসুক রিপোর্ট আগে
স্বর্গে গেলেই যাবে সেরে সব ওষুধ দু-এক দাগে !

বললে গণেশ, জানাতে তবু হবেই দিদি লক্ষ্মী
বিপদ কিছু ঘটলে তখন সামলাবে কে ঝক্কি ?
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরই সব অগতির গতি
তাঁদের কাছে রাখলে গোপন আমাদেরই তো ক্ষতি !

সিওর কিওর, সিওর কিওর, পিওর ওষুধ খেলে
অশ্বিনীদা-র মতো ডাক্তার আর কি কোথাও মেলে ?
কিন্তু বাবা জানলে রাগে হয়েই শেষে অন্ধ
করে দেবেন মর্ত্যে আসা এক্কেবারেই বন্ধ !

বলেই হেসে গণেশ শেষে মোবাইল ফোনে ধরে
ড্যাডিকে সব জানিয়ে দিলো মহাষষ্ঠীর ভোরে !
শিবও ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিলেন বেশ হয়েছে, বেশ
এবার থেকে তোদের সবার মর্ত্যে যাওয়াই শেষ !

বাঁচতে যদি চাস্ তো সবাই এক্ষুণি আয় ফিরে
ভয় পাস্ না, আমার আশিষ রাখবে তোদের ঘিরে !
ম্যাসেজ পেয়েই ছুটল সবাই, টুটল মনের ভয়
সবাই মিলেই উঠল বলে, ভোলেবাবা-কি জয় !

অপূর্ব দত্ত
একলা বালক

তিরতির করে বয়ে যাওয়া এক নদী
জোয়ার-ভাঁটাও খেলে,
সারিবাঁধা ছিপনৌকোর থেকে রাতে
জেলেগুলো জাল ফেলে।

পালতোলা বড় বালির নৌকো যত
নোঙর ফেলত ঘাটে,
মাঝি-মাল্লারা ভাত ডাল রাঁধে কেউ
কেউবা সবজি কাটে।

কোন দেশে থেকে তাদের যাত্রা শুরু
কোথায় বা যাবে শেষে,
বালক সেকথা জানে না, হয়তো ভাবে
আরেক নতুন দেশে।

বিকেলবেলায় বাঁশের সাঁকোতে বসে
উদাসী দুচোখ মেলে
বালকটি দেখে শিমুল গাছের ফাঁকে
সুয্যি যাচ্ছে হেলে।

সন্ধে নামছে, মালোদের বাঁশঝাড়ে
জোনাকির আলোছায়া,
মাথার ওপরে চতুর্দশীর চাঁদ
জাগিয়ে তুলছে মায়া।

শাঁখ বেজে ওঠে চারপাশে ঘরে ঘরে
বালকটি তাড়াতাড়ি
চাঁদটাকে দেখে মা-র মুখ মনে করে
পায়ে পায়ে ফেরে বাড়ি।

সুখেন্দু মজুমদার
ছবি আর ছবি

একটা ছবি দেয়াল জুড়ে
একটা খাতায় আঁকা
একটা ছবি টিভির ভিতর
পালিয়ে গেলেই ফাঁকা।
একটা ছবি দরজা জোড়া
একটা গ্রিলে নাচে
একটা ছবি লেপটে আছে
বুক্ শেলফের কাঁচে।
একটা ছবি ফ্রিজের গায়ে
একটা দাদার নেটে
একটা ছবি দেয় পাহারা
দিব্যি বাড়ির গেটে।
একটা ছবি হিজলডাঙা
একটা চড়কমেলা
একটা ছবি ছড়ায় লেখা
রঙিন ছেলেবেলা।

জয়নাল আবেদিন
ছুটির বাঁশি

শরতে আকাশ নীল
ফোটে কাশফুল
বেজেছে ছুটির বাঁশি
নেই ইসকুল।
গা শুকোয় মাঠময়
ভেজা রোদ্দুর,
মন্ডপে মন্ডপে
দুগ্‌গা ঠাকুর।
ভোরবেলা শীত শীত
বেজে ওঠে ঢাক
আলোর ঝিলিক দেখে
দু'চোখ অবাক।
ঘরে ঘরে আলপনা
পুজোর প্রসাদ
এ খুশিতে ছোট বড়
কেউ নেই বাদ।

অপূর্বকুমার কুন্ডু
বৃষ্টি

ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
চাঁপার ডালে নামল এসে,
তখন সবুজ মাঠের শেষে...
একলা একা উঠল মেতে
বৃষ্টি ভেজার আনন্দে সে।
বকটা যখন জল থই থই
আনন্দ আর যায় না রাখা,
বৃষ্টি খুশির স্বপ্ন আঁকা।
বৃষ্টি ভেজা বাতাস ছোটে
সঙ্গে চাঁপার গন্ধ মাখা।
দিগ্বিদিকের মেঘগুলো সব
দিচ্ছে ঢেকে আকাশ পাড়া,
তার খুশি তো সৃষ্টিছাড়া।
গানের নদী উঠল দুলে
আপন বেগে পাগলপারা।

দীপ মুখোপাধ্যায়
সেই খেলাঘরে

ছুটে চলে যাই এখানে সেখানে
এলোমেলো পথে সুদূরের টানে
পাতার আড়ালে পাখিদের গানে
সুর ভাসে তুলতুলে —

একজোড়া হাঁস পুকুরের ধারে
ফুল ফুটে আছে বুনো ঝোপঝাড়ে
অপলক চোখে দেখি বারেবারে
মনের দরজা খুলে।

মেঘ ভেসে চলে মাথার ওপরে
রোদ্দুর মেখে প্রজাপতি ওড়ে
ঘাসপাতাগুলো প্রহরে প্রহরে
আহ্লাদে গলে পড়ে —

কানীবক ওড়ে একটি কি দুটি
জলে ঘাই মারে মৌরলা-পুঁটি
আমি যেন সেই ক্ষুদে বিচ্ছুটি
স্বপ্নের খেলাঘরে।

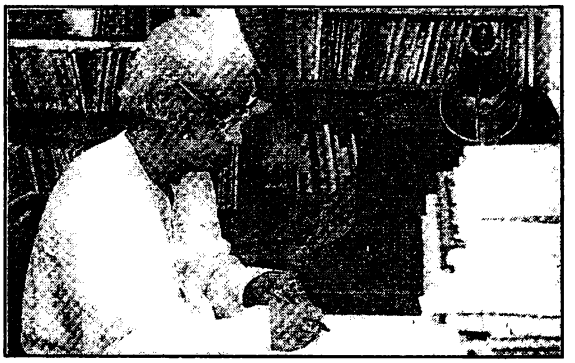

রূপক চট্টরাজ

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছড়া লেখা এমন কি আর ? নয়তো কিছু ভয়ঙ্কর,
ছন্দ মিলে খুশির ছোঁয়া, মিললে যেমন হয় অঙ্ক,
কঠিন নরম যা কহ যে,
সহজ কথাই খুব সহজে
লিখতে শেখান যিনি, তিনি - রায় অন্নদাশঙ্কর।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

পুরানো, কিন্তু....

পুরানো মানুষ,
মানে, যাঁকে বলি বুড়ো,
খুব বুড়োদের
বলি বুড়ো- থুড়থুড়ো।
পুরানো টাকারা এখন অচল, জানি,
পুরানো দিনকে ইতিহাস বলে মানি।
পুরানো বাড়িতে বাস করা বড় দায়,
কখন যে তা'র ইঁট-কাঠ খসে যায়!
পুরানো গাড়ির ইঞ্জিন গোলমেলে,
মাঝ পথে এসে ঝামেলায় দেয় ফেলে।
পুরানো বইয়ের কদর ক'জন বোঝে ?
পুরানো মুদ্রা সংগ্রাহকেরা খোঁজে।
পুরানো পোষাক ছিঁড়ে যায় দিলে চাপ,
পুরানো সূর্য তবু তার বাড়ে তাপ।
কিন্তু পুরানো চাল পেলে কে বা ছাড়ে ?
কারণ সে চাল ফুটোলেই ভাতে বাড়ে।

পবিত্র সরকার

যা খাব তার

খুব ভালো নেই আজকে পেটটা ;
কেন যেন বেশি হচ্ছে না খিদে —
কী যে খাব ভেবে হয় অসুবিধে,
কোরো না হে সাধাসাধির চেষ্টা।

কিন্তু কীসের পাচ্ছি গন্ধ ?
সুড়সুড়ি লাগে নাকের ভেতরে,
শরীরটা ওঠে চনমন করে —
গন্ধটা কেন লাগে পছন্দ ?

লুচি কি ভাজছে টাটকা-টাটকা
তা হলে তো এটা কর্তব্যই —
শুধু শুধু খাব গোটা নব্বই ;
পারিস তো তোরা আমাকে আটকা।

কী বললি ? আছে পাঁঠার মাংস ?
শরীরটা ভালো নয়কো যদিও—
লুচি আরও তবে শ-খানেক দিয়ো।
খাব যা খাই তার চতুর্থাংশ।

বিষ্ণু সামন্ত
বাংলা পড়া

ইং-মিডিয়ামে পড়ে নাইনের ছেলে,
বড় অসহায় লাগে বাংলা ক্লাস এলে।
ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেন স্যার কতকিছু,
লেখে যেন ছেলেটি তা হয়ে পড়ে নীচু।
আসলে লেখার ভান করে হায় সে যে,
খুশি হয় — ঘন্টাটি যবে যায় বেজে।
মনে শুধু ভাবে যদি বোর্ডখানা নিয়ে —
জেরক্সটা করা যেত মার্কেটে গিয়ে!
বাংলা কঠিন বড়ো, বাংলা আড়ষ্ট,
অজানা ভাষার মতো লিখতে যে কষ্ট!

সতীরঞ্জন আদক
পূজা মানে

টাপুর টুপুর বৃষ্টি নেই
নীলচে আকাশ সূর্য হাসে
শিউলি টগর ফুটছে বনে
ঝরছে শিশির সবুজ ঘাসে।
রোদের চাদর জড়িয়ে গায়ে
ঝিকির মিকির করছে মাঠ
আয় না সবাই দেখেই আসি
নায়ের মাঝির নৌকা ঘাট।
উদাস বাউল গাইছে গান
আসছে ভেসে গানের সুর
সবাই তখন কাছেই এসে
মিলিয়ে দেবে নিকট দূর।
পূজা মানেই হৈ হুল্লোড়
দ্বন্দ্ব দ্বিধা যাবেই সরে
খুশির আলোয় কাটাতে দিন
দুর্গা মায়ের আশিষ ঝরে।

সুজিতকুমার পাত্র
ছড়া লেখা কম্মো তো নয়

খামখেয়ালি মনটা আমার
নানান রকম দ্বন্দ্বে ভরা
লিখতে গিয়েও হয়না লেখা
একটা ছড়া ছন্দে ভরা।
মন চলে যায় জানলা গলে
চিন্তা ভালো মন্দে ভরা
নাকে আসে টাটকা সুবাস
নানান ফুলের গন্ধে ভরা।
একটু লিখে থমকে যে যায়
খাচ্ছি হোঁচট অন্ত্যমিলে
চুল ছিঁড়ি আর যুদ্ধ বাধায়
বত্রিশখানা দন্তমিলে।
ভেবেছিলাম ছড়া লেখা
নয় তো কোনো কঠিন ব্যাপার
বুঝছি এবার হাড়ে হাড়ে
পরশ পাথর খোঁজা খ্যাপার।
ছড়া লেখা কম্মো তো নয়
চালাই গিয়ে কোদাল শাবল
কিম্বা আবার খুঁটিয়ে পড়ি
খাই খাই আর আবোল তাবোল।

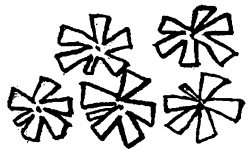

তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
শরৎ আসুক ফিরে

মাঠে একগাদা কাশ দুলে দুলে হেসে যায়
একপাল সাদা হাঁস জল কেটে ভেসে যায়।
আকাশেতে তুলো মেঘ জমে যেন রয়েছে
নীল-সাদা ছোপ ছোপ আঁশ যেন হয়েছে।
কাশে আর আকাশে নেই খেলা আড়ি-ভাব
সাদা হাঁস তুলো মেঘ দু'জনের ভারি ভাব।
শরতের আগমনে খুশি খুশি মন তাই
আবার আসুক ফিরে এই শুভক্ষণটাই।

উৎপলকুমার ধারা
ঝরেপড়া খুশি

লাট খায় মেঘে সুতোকাটা ঘুড়ি
কিসের খুশিটা কুড়োতে
শিউলি তলায় পড়ে হুড়োহুড়ি
রাত না ফুরোতে-ফুরোতে!

পাখির পালকে খুশি যায় ভরে
খুশি ঢালে রাঙা রোদ্দুর
পুবালী হাওয়ারা খুশি কাঁড়ি করে
পাঠায় তা পারে যদ্দুর!

কী এক অচেনা খুশি যেন মনে
ফুলেদের মতো ফুটছে।
আলপথ ধরে কাশফোটা বনে
অজানা খুশিতে ছুটছে!

খাতায় বাঁধানো ছড়া-কবিতা রা
দুম করে তারা বেরিয়ে
কিসের খুশিতে হয়ে ঘরছাড়া
ছোটে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে!

খুশিতে যখন আকাশটা নীলে
সাজিয়েছে সাদা তুলোকে
এসো মাখি আজ একসাথে মিলে
ঝরে পড়া খুশিগুলোকে!!

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়
ছু মন্তর

এক পা দু পা আড়াই পা
কোন রাস্তায় বাড়াই পা ?
সামনে সবই বন্ধ দ্বার।
নিকষ কালো অন্ধকার।

কেউ কাছে নেই ডাইনে বাঁয়—
বলবে ডেকে আয় নে আয়
সোনারকাঠির হাতছানি
মুছবে তিমির রাতখানি।

নিদ্রা ভাঙুক ঘুমন্তর
কাটছে আঁধার ছু মন্তর।

বাংলাদেশের ছড়া ও কবিতা

নীহার মোশারফ
পাখি নেই

রজনীকান্ত তোমার বাবুই
যায় না দেখা আর —
তালগাছ নেই পাশাপাশি
রাখালিয়ার বাঁশের বাঁশি
বুনবে বাসা কেমন করে
লতাপাতায় খাসা খাসা।
ভেঙে গেল পাখির আশা
হারিয়ে গেল ভালোবাসা।

জসীম মেহবুব
এই মধুমাসে

আমপাকা জ্যৈষ্ঠের
উত্তাপে ঘামি,
জলভরা পুকুরে
ঝুপ করে নামি।
টুপ করে ডুব দিয়ে
ভুস করে উঠি,
আজ নেই কোন পড়া
ইসকুল ছুটি।
কাঁচা আমে নুন-ঝাল
জিভে জল আসে
কী যে মজা হইচই
এই মধুমাসে।
থাক থাক মধুমাস
বৎসর জুড়ে
আম-জাম-লিচু খাবো
গানে সুরে সুরে।

অরুণ শীল
আর এসো না ঝেঁপে

উঠোন বাড়ি না ডুবিয়ে বৃষ্টি এবার যাও।
অনেক হলো টাপুর টুপুর, এবার বিদায় নাও।

রোদের জন্য সূর্য আঁকি, আকাশ আঁকি নীল,
কাশের সাদা বন এঁকেছি, শালুক ফোটা বিল।

শিউলি ফোটা গাছ এঁকেছি, দোয়েল আঁকি দ'টো।
মা বললেন, তুলোট মেঘও দাও এঁকে একমুঠো।

চিল এঁকেছি ঘুড়ি এঁকেছি, ঘুড়ি আমার প্রিয়।
ইচ্ছে হলে যাবার সময় এ ছবিটাও নিও।

বিল-ঝিল সব টুবু টুবু বন্যা এসেছিল,
ধানের গোলা পানের বরজ সব ভাসিয়ে নিলো।

তবুও ভালো ঘর ভাসেনি, ভাসেনি ইস্কুল
বৃষ্টি তুমি যাওনা চলে দেব খোঁপায় ফুল।

বৃষ্টি ফোঁটা, বৃষ্টি ফোঁটা, মেঘের গাড়ি চেপে
যে দিক খুশি যাওনা চলে, আর এসোনা ঝেঁপে।

আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার

সত্যজিৎ রায়

'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল ফেলুদার প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। ঐ পত্রিকায় গল্পটি মোট তিন কিস্তিতে শেষ হয়। তাই সেই হিসেবে এই ২০১৫ সালে ফেলুদার পঞ্চাশ বছর হবে। সত্যজিৎ রায়ের একটি খাতা থেকে (১৯৮৩) ফেলুদার এই অসমাপ্ত খসড়াটি পাওয়া যায়। কেমন হত এই গল্পের শেষটা ? এটা তো আমাদের সকলেরই জানতে ইচ্ছে করে। এই অসমাপ্ত খসড়ার রেশ ধরে গল্পটি শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। *(সৌজন্যেঃ আনন্দমেলা, মে ২০১৫)*

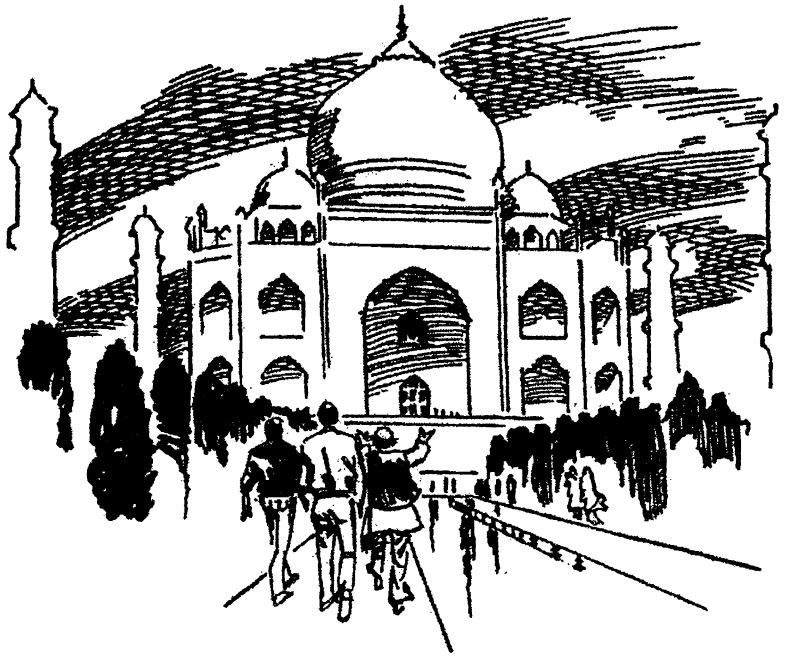

"কোনও মানে হয় ?" বললেন লালমোহনবাবু। "হংকং পর্যন্ত দেখে এলুম, অথচ তাজমহল দেখলুম না এখনও।"

কথাটা সত্যি। দিল্লি গেছি সিমলা যাবার পথে, রাজস্থান যাবার পথে। কিন্তু আগ্রা যাওয়া হয়নি। আসলে আজকাল আমাদের কোথাও যাওয়া মানে একটা রহস্য ধাওয়া করে যাওয়া। আগ্রায় ফেলুদার কোনও কেস পড়েনি, তাই যাওয়া হয়নি।

ফেলদু বলল, "আপনার রেলওয়ে বুকিং আপিসে তো কে চেনা আছে বলেছিলেন – দেখুন না দিন দশেকের মধ্যে একটা ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্ট পাওয়া যায় কি না।"

"ফার্স্ট ক্লাস তো ?"

"আমার তো অন্যতেও আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি ফার্স্ট ছাড়া ট্রাভেল করলে তো প্রেস্টিজ থাকবে না। বাংলার

বেস্ট সেলিং রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক – সে কি আর থ্রি টিয়ারে যেতে পারে ?"

"হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ – আপনি কথাও বলতে পারেন। না, সিরিয়াসলি বলছি – যাবেন আগ্রা ?"

"হামিন অস্ত্ হামিন অস্ত্ হামিন অস্ত্ –"

"সেটা আবার কী ?"

"বিশ্বে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে, তো সে এখানেই, এখানেই, এখানেই। তাজমহলের গায়ে ফরাসি ভাষায় লেখা আছে।"

লালমোহনবাবু প্রতিবেশী রেলওয়ে বুকিং আপিসের কর্মচারী পরিতোষ হোড়ের দৌলতে সাতদিনের মধ্যেই আমরা রেলে রিজার্ভেশন পেয়ে গেলাম। রাত আটটার ট্রেন। আধঘন্টা আগে গিয়ে বইয়ের দোকান থেকে পথে পড়ার দু-একটা পত্রিকা কিনে কম্পার্টমেন্টে ঢুকে দেখি ঘর ভর্তি লোক। বুঝলাম যে যাচ্ছে একজনই, বাকি সব সি অফ করতে এসেছে। আমাদের দেখে অবিশ্যি একটা লোয়ার বার্থ খালি করে দেওয়া হল, আমরা হাতের জিনিসপত্র রেখে তাতেই পাশাপাশি বসলাম।

এর মধ্যে কোনজন যে যাত্রী সেটা কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল। বছর পঞ্চাশ বয়েসের ভদ্রলোক, চোখে চশমা, চওড়া কপালের পিছন দিকে কাঁচা পাকা মেশানো ঢেউ খেলানো ব্যাকব্রাশ করা চুল। চেহারায় যেটার ছাপ আছে - প্রোফেসর বা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হলে আশ্চর্য হব না। কথাবার্তায় বুঝলাম ভদ্রলোক দিল্লি যাচ্ছেন একটা বক্তৃতা দিতে - কী বক্তৃতা তা অবিশ্যি বোঝা গেল না।

ফেলুদা আড়চোখে ভদ্রলোককে দেখছে, একবার ফিসফিস করে বলল, ব্যস্ত মানুষ আপন ভোলা।

"কী করে বুঝলে ?"

ফিস ফিস করে উত্তর হল, "ডান হাতের তিনটে নোখ কেটেছে—বাকিগুলো ভুলে গেছে। তার মানে অন্যমনস্ক। যে দুটো কাটেনি সে দুটো এত বড় - তা থেকে বোঝা যায় সময় পায়নি, অর্থাৎ ব্যস্ত। আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে।"

"আর কী বুঝলে ?"

"আরগুলো তোরও বুঝতে পারা উচিত। যেমন ভদ্রলোকের পদবি বোস, বল, বর্মন, বর্ধন, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্যি, ভৌমিক, বসাক, বটব্যাল বা ব্রহ্মচারী।"

ভদ্রলোকের সিটের তলায় একটা ভি. আই. পি-র হ্যান্ডেলের দুপারে "এ.বি" অক্ষরগুলো রয়েছে সেটা এবার চোখে পড়ল।

ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে কম্পার্টমেন্ট খালি হয়ে গেল।

লালমোহনবাবু উঠে বললেন, "আমি কিন্তু আপার বার্থ নিচ্ছি।"

ফেলুদা বলল, "আপনি প্রৌঢ় বয়সে কেন আর কষ্ট করে উঠবেন–"

"প্রৌঢ় – ! আই অ্যাম ওনলি ফর্টি থ্রি ! আর উপরে আমার ঘুমটা আরও ভাল হয়।"

"তথাস্তু।"

"দিল্লি যাচ্ছেন ?"

সহযাত্রী লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন। বোধহয় বয়স ওঁর বেশি দেখে ওঁকেই আমাদের দলপতি ঠাউরেছেন।

"আগ্রা" – হেসে বললেন লালমোহনবাবু, "আপনিও কি –"

"আমি আগে যাব দিল্লি – একটা বক্তৃতা আছে, তারপর আগ্রাই যাবার কথা আছে। এখনও তাজমহলটা দেখা হয়নি।"

"আরে, আমাদেরও তো ঠিক সেই ব্যাপার।"

"তাই বুঝি ?"

ভদ্রলোক একটা ছোট ব্যাগ খুলে, তার থেকে একটা নোটবুক বার করলেন।

"এক্সকিউজ মি," ফেলুদা বলল, "ওই ব্যাগের ভিতরের পত্রিকা থেকে আপনাকে বৈজ্ঞানিক মনে হয়।"

"হ্যাঁ। আই অ্যাম এ কেমিস্ট।"

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করল, "সম্প্রতি কি খবরের কাগজে নাম উঠেছে ?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"আদিত্য শেখর বর্ধন ?"

ভদ্রলোক হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। "আপনি তো নমস্য ব্যক্তি মশাই। আপনি পেট্রোলের একটা বিকল্প পদার্থ আবিষ্কার করেছেন না ?"

"পদার্থ ঠিক নয়। সোলার পাওয়ার ব্যবহার করে পেট্রোলের কাজ চালানো যায়, এমন একটা ব্যাপার।"

লালমোহনবাবু হাঁ করে দুজনের কথা শুনছেন।

ফেলুদা বলল, "আমার তো মনে হয় এটা একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। কারণ পেট্রোলিয়ামও চিরটাকাল থাকবে না। পৃথিবীতে তেলের স্টক তো অফুরন্ত নয়। এমনকী মিডল ইস্টেও নয়।"

"ঠিকই বলেছেন। এটা একটা আন্তর্জাতিক হেড-এক।

তেল ফুরোলে কী হবে ?"

"তা আপনি এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেননি ? একটা ফরমুলা তো আছে নিশ্চয়ই।"

"তা আছে বইকী। তবে এ তো আমাদের মাসখানেকের ব্যাপার। আমি রিসার্চ করছি আজ তিন বছর ধরে।"

"কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে এটা একটা গোল্ডমাইন ! ফরমুলাটা সাবধানে রেখেছেন তো ? ওটা কিন্তু —"

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একজন ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকেছেন। প্রায় ছ-ফুট লম্বা, আর মামানসই রকমের চওড়া পাকানো, গোঁফ, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। দুজন অমিনেন্ট লোক এক কম্পার্টমেন্টে ট্র্যাভেল করছেন শুনে দেখতে এলাম।

এ কী ! লোকটা ফেলুদাকে চেনে নাকি ? নাকি লালমোহনবাবুকে ?

"মে আই সিট ডাউন ?"

"নিশ্চয়ই।"

মিস্টার বর্ধন তাঁর বাক্সটা সরিয়ে জায়গা করে দিলেন। নতুন ভদ্রলোকটি ইংরিজি মিশিয়ে হিন্দিটানে বাংলা বলেন।

"আমি আপনাদের চিনি না, পাশের বোগিতে এক ভদ্রলোক বললেন আপনাদের কথা। দি কোয়েশ্চেন ইজ - কে সাহিত্যিক আর কে ডিটেকটিভ ?"

মিঃ বির্ধনও অবাক। "আপনি কি ডিটেকটিভ নাকি ?" ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাই আমার পেশা। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। ইনিও এঁর লাইনে কম বিখ্যাত নন। মিঃ গাঙ্গুলী — রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখেন।"

"হেঁ হেঁ।"

"হাউ ইন্টারেস্টিং," বললেন মিঃ বর্ধন। "বুঝেছি — তাই জন্যেই সাবধানতার কথা বলছিলেন। আপনার বোধহয় ওই সব ফরমুলা চুরির ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে ?"

"তা অল্পবিস্তর আছে, মিঃ বর্ধন।"

আগন্তুক ভদ্রলোক বোধহয় মনে করলেন এবার তাঁর পরিচয়টাও দেওয়া উচিত। হয়তো তাঁর লাইনে তিনিও কম কিছু বিখ্যাত নন।

"মাই নেম ইজ যোগীন্দর রাঠোর। আমার কারবার আছে দিল্লিতে — জুয়েলারি। আপনার বিষয় আমি পেপারে পড়েছিলাম। ভেরি ইন্টারেস্টিং। আই থিঙ্ক ইউ উইল বি এ রিচ ম্যান সুন।"

"জানি না," হেসে বললেন মিঃ বর্ধন। "এমনও হতে পারে যে এ জিনিস আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমার ফরমুলার কোনও মূল্যই থাকবে না। এই টেকনোলজির যুগে বৈজ্ঞানিকরা তো আর বসে নেই।"

"এনিওয়ে," — মিঃ রাঠোর উঠে পড়লেন, "যদি আপনার ফরমুলা বিক্রি করার কথা ভাবেন, দেন থিংক অফ মি ফার্স্ট। হে হে- আমার অফার রইল।"

মিঃ রাঠোর চলে যাওয়াতে কামরাতে হঠাৎ যেন জানাজানি বেড়ে গেল।

"আপনি তো খদ্দের পেয়ে গেলেন মশাই," বললেন লালমোহনবাবু।

মিঃ বর্ধন হেসে বললেন, "খদ্দের এখানে কেন ? বাইরে থেকেও এনকোয়ারি এসেছে। দুটো আমেরিকান কেমিক্যাল ফার্ম। আমি সামনের মাসেই স্টেটসে যাচ্ছি। তারপর দেখা যাক কী হয়। আপনারা কোথায় উঠছেন আগ্রায় ?"

"আগ্রা হোটেল," বলল ফেলুদা।

"প্রোফেশনালি হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা করার কোনও প্রয়োজন হবে না — আশা করি না — তবে আমি আগ্রা যাব শনিবার। থাকব ক্লার্কে। যদি ফাঁক পান একবার চলে আসবেন। ওখানে আমার কোনও কাজ নেই। — তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি — এইসব দেখার জায়গাগুলো একটু দেখব আর কী। সঙ্গী পেলে ভালই লাগবে। আর আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ মিত্র। আপনি গোয়েন্দা, তাই বোধহয় চতুর্দিকে ক্রিমিন্যাল দেখতে পান। আমার ফরমুলা নিরপদেই থাকবে।"

লালমোহনবাবু বললেন, "একবিন্দু নয়নের জল, কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বোল, হে তাজমহল।" পাশ থেকে দু'তিন জন ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে তাকালেন। কিন্তু লালমোহনবাবু দমলেন না। বললেন, "তাজমহল যমুনা নদী থেকে যে এতটা দূরে কে জানত মশাই ? আমি তো ভেবেছিলাম আমার পরবর্তী রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস "তাজমহলে ভয়াল বিপদ"-এর নায়ককে তাজমহল থেকে সোজা ঝাঁপ দেওয়াবো যমুনার জলে। কিন্তু বাস্তবে যে সেটা কোমনতেই সম্ভব নয় তা বেশ বুঝতে পারছি।"

ফেলুদা বলল, "ঝাঁপ দেওয়াতেই পারেন, বাধা কোথায় ? তবে সেক্ষেত্রে দেখবেন আপনার গল্পের হিরোর পা যেন ভেঙ্গে না যায়। একটু ব্যথা পেলেও পেতে পারে। গল্প-উপন্যাসে তো এরকম হয়েই থাকে ! কি বলেন লালমোহনবাবু ?"

তোপসে ডানদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "ফেলুদা ঐ পাতাবাহার গাছের আড়ালে একটু আগে আমি আদিত্য শেখর বর্ধনকে দেখলাম মনে হল। তিনি দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।"

ফেলুদা ও লালমোহনবাবু দু'জনেই সেদিকটায় তাকালেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না।

ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শাহাজাহান কিন্তু এই তাজমহল নির্মান কাজ শেষ হবার আগেই তাঁর ছেলের হাতে বন্দী হন। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি আগ্রার কেল্লায় বন্দী হয়ে দূর থেকে তাজমহলের শোভা দেখে কাটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সৈন্যরা তাজমহলের খুব ক্ষতি করে। সরকারি কর্মচারীরা তাজমহলের পেটের মধ্যে থাকা মূল্যবান ও দামী নীলকান্তমণি উপড়ে নেয়।"

কথা বলতে বলতে সবাই এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই আদিত্যবাবু একেবারে সামনা সামনি এসে পড়লেন। ফেলুদাকে দেখে তিনি বললেন, "মিঃ মিত্র আজ সকালেই আমি আগ্রায় এসে পৌঁচেছি।" এরপর তিনি ফেলুদার আরো কিছুটা কাছে ঘেঁসে চাপা স্বরে বললেন, "আগ্রায় পা দিতেই এখানে দু'একজন আমার পিছু নিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় 'মাতৃমন্দির সোসাইটি হলে' একটা সেমিনার ছিল। সেখানে আমি বক্তৃতা শেষ করে হলের বাইরে আসতেই আমার গাড়ির ড্রাইভার আমাকে একটা ছোট্ট চিরকুট দেয়।" এই বলে তিনি জামার পকেট থেকে চিরকুটটা বের করে ফেলুদাকে দেখতে দিলেন। ফেলুদা দেখল তাতে লেখা আছে, "ফরমুলাটা চাই, আগ্রায় গিয়ে কথা হবে।"

ফেলুদা বলল, "এই চিরকুটটা আমার কাছে রাখতে পারি ?"

আদিত্যবাবু বললেন, "হ্যাঁ রাখুন।" এই বলে তিনি চারপাশটা আরো একবার দেখে নিলেন। তারপর ফেলুদাকে বললেন, "আগ্রায় এসেই আমি আপনাদের হন্যি হয়ে খুঁজছি শুধুমাত্র এই খবরটা দেব বলেই।"

ফেলুদা বলল, "একটু আগে আপনি বলছিলেন কারা যেন আপনার পিছু নিয়েছে। সেটা যদি আরেকটু পরিস্কার করে বলেন।"

আদিত্যবাবু বললেন, "ক্লার্ক ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নীল রঙের চেক শার্ট পরা একজনকে দেখতে পাই। লোকটা একটু দূরে দূরে আমাকে লক্ষ্য রাখার পর একসময় চলে যায়। সেই লোকটাই আজ একটু আগে একজন সঙ্গীকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। বলে, আমরা রাঠোরের লোক। রাঠোর আজকেই আমার সাথে দেখা করতে চায়।"

ফেলুদা বলল, "আপনি কি বললেন ?"

"এক কথা বারবার বলবার লোক আদিত্য শেখর বর্ধন নন। তাকে বলবেন ওরকম খদ্দের আমার দেশে-বিদেশে অনেক রয়েছে। এই কথাগুলোই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি তাদের", আদিত্যবাবু বললেন।

"চলুন আপনার রুমে গিয়ে বাকি কথা শোনা যাবে", ফেলুদা বলল।

রাস্তায় ফেলুদা সিটে হেলান দিয়ে যোগীন্দর রাঠোরের মুখটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। তার পাকানো গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা মনে রাখার মতো। "আচ্ছা যোগীন্দরের গোঁফ দাড়িটা নকল নয় তো ?" ফেলুদা ভাবতে লাগলেন। মিঃ বর্ধনকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। তাঁর ফরমুলাটা অত্যন্ত সাবধানে রাখা দরকার। সোলার পাওয়ার ছাড়া আগামী দিনে আর কোন বিকল্পই হয়তো থাকবে না। তাই এই যুগান্তকারী আবিস্কারটা মানব সভ্যতাকে এক ধাপ এগিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু মিঃ বর্ধনই তো ট্রেনে আসার পথে বলেছিলেন "আপনি গোয়েন্দা, তাই চতুর্দিকে ক্রিমিন্যাল দেখতে পান।" তিনি বলেছিলেন "আমার ফরমুলা নিরাপদেই থাকবে।" কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব ? রাঠোরের লোকজন বেশ ঠারেঠোরেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা ফরমুলাটা মিঃ বর্ধনের কাছ থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে ছিনিয়ে নিতে চায়। হয়তো রাঠোর বিদেশি কোন কেমিক্যাল ফার্মে অত্যন্ত চড়াদামে ফরমুলাটা বিক্রি করে দেবার মতলব করেছে। সত্যিই কি তার দিল্লিতে জুয়েলারির ব্যবসা আছে ?

লালমোহনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন "আরে কি আশ্চর্য! এই মাত্র নীলরঙের চেক শার্ট পরা একজন লোককে দেখতে পেলাম। আমাদের গাড়িটাকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল।"

তোপসে বলল, "কালো রঙের পুরনো একটা এম্বাসেডার তো ? আমিও লক্ষ্য করেছি।"

রাত দশটা বাজে। হোটেল ময়ূরের সাত নম্বর রুমে মিঃ বর্ধন ফেলুদার সঙ্গে গল্প করছেন। পাশেই লালমোহনবাবু আর তোপসে একমনে সেই গল্প শুনে যাচ্ছে। ফেলুদা একপ্রকার জোর করেই মিঃ বর্ধনকে এখানে নিয়ে এসেছে। ইংরাজিতে টাইপ করা আড়াই-তিনশো পৃষ্টার একটি সুদৃশ্য বাঁধানো খাতা বা বইয়ের মধ্যে মিঃ বর্ধন তাঁর আবিস্কারের সমস্ত ইতিহাস ও ফরমুলা ইত্যাদি লিখে রেখেছেন। সেটি খাটের উপর একপাশে ফেলে রাখা আছে।

সওয়া দশটা নাগাদ বাইরের বেল বেজে উঠলো। ফেলুদা দরজা খুলতে গেল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে

পড়ল যোগীন্দর রাঠোর। সঙ্গে আরো একজন সঙ্গী।

ফেলুদাই প্রথমে কথা বলল, "আসুন মিঃ রাঠোর। দেখুন আবার কেমন দেখা হয়ে গেল। তা আপনার জুয়োলারির ব্যবসা কেমন চলছে ?"

রাঠোর কোন প্রকার ভনিতা না করে মিঃ বর্ধনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসল রত্ন তো এখানেই আছে। তাই ব্যবসার কাজেই এখানে আসতে বাধ্য হলাম।" কথাটা বলার পরেই রাঠোরের চোখ গেল বাঁধানো বইটার দিকে। যেটাকে ফেলুদা 'টোপের' মত বিছানায় ফেলে রেখেছিল।

রাঠোর তাঁর সাগরেদকে চোখের ইঙ্গিত করতেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে বইটা তুলে নিল।

রাঠোর এবার তার নিজস্ব মূর্তি ধারণ করে বলল, "আমার কাছ থেকে এক কানা-কড়িও আপনি পাবেন না মিঃ বর্ধন। কেননা এটা আমাকে আপনি বিক্রি করেননি আমাকে কেড়ে নিতে হয়েছে। হোটেলের বারান্দা থেকে নীচ পর্যন্ত আমার লোকেরা ঘিরে রেখেছে তাই বেশি লাফালাফি করেও লাভ হবে না আপনাদের।" শেষ কথাগুলো বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়েই বললেন রাঠোর।

লালমোহনবাবু হাঁ করে রাঠোরের কথা শুনছেন। ফেলুদা ইশারায় কোন নির্দেশ করছে কি না সেদিকে তোপসে লক্ষ্য রাখছিল। কিন্তু সে এখনো সেরকম কিছু নির্দেশ পায়নি।

ফেলুদা বেশ ঠান্ডা গলায় বলল, "আপনি মোটেই একজন জুয়েলারি ব্যবসাদার নন মিঃ রাঠোর। না, এটা আমাকে কেউ বলেনি। আপনার কাজের ধরন দেখেই এটা বুঝতে পারছি। কেননা আপনি এটা বুঝলেন কি করে যে ঐ বাঁধানো বইটাতেই আসল ফরমুলা লেখা রয়েছে ? দামী জিনিস কি এভাবে কেউ যেখানে সেখানে ফেলে রাখে।" ফেলুদা তার মগজাস্ত্র কাজে লাগাতে শুরু করল।

ফেলুদার কথা শেষ হতেই রাঠোর পকেট থেকে ছোট্ট একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে উঁচিয়ে ধরে বলল, "আমার সঙ্গে কেউ চালাকি করতে যাবে না। তাহলে ফল ভালো হবে না বলে দিলাম।" দশাশই চেহারার লোকটি বাঁ হাত দিয়ে ফরমুলার বইটি ধরে ডান হাত পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় ফেলুদা সজোরে ডান পা চালিয়ে লোকটার বাঁ হাতে আনাড়ির মত লাথি মারল। এতে হাতে ধরা বইটা ছিটকে একটা সোফার নীচে ঢুকে গেল। লোকটা পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলুদার দিকে তাক করল। ফেলুদা সঙ্গে সঙ্গেই মাথার উপর হাত তুলে ফেলল। লালমোহনবাবু অনেকক্ষণ আগে থেকেই হাতদুটো মাথার উপর তুলে রেখেছিলেন।

রাঠোর ঝট করে পাশ-বালিশটা তুলে তার নীচ থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করে আনলেন। ব্যাগ খুলে তিনি একটি সুন্দর ও ভারী নীল ডাইরি পেয়ে গেলেন। আনন্দে তাঁর চোখদুটো চক্ চক্ করে উঠল। আর কোন কথা না বলে দু'জনেই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদা দরজা বন্ধ করে সোফার নীচ থেকে বহুমূল্য ফরমুলার বাঁধানো খাতাটা খুঁজে বের করে ধুলো ঝাড়তে লাগল। মিঃ বর্ধনের উপর যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। তিনি চুপচাপ বসেছিলেন। ফেলুদা তাঁর হাতে খাতাটা তুলে দিয়ে বলল, "রিলাক্স মিঃ বর্ধন। আমাদের মানে গোয়েন্দাদের 'ফরমুলা' কাজে লেগে গেল বলেই এ যাত্রা আপনার 'ফরমুলাটা' বাঁচাতে পারলাম।"

"কাল সকালেই আমাদের কলকাতার প্লেন ধরতে হবে। আশা করি আপনিও আমাদের সফর সঙ্গী হবেন, কি বলেন ?" ফেলুদা খাটে আরাম করে শুতে শুতে বলল।

লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, "কলকাতাই হল বাঙালিদের 'হামিন অস্ত্ হামিন অস্ত হামিন অস্ত' , কি বলেন ফেলু বাবু ?"

তাঁর কথায় সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

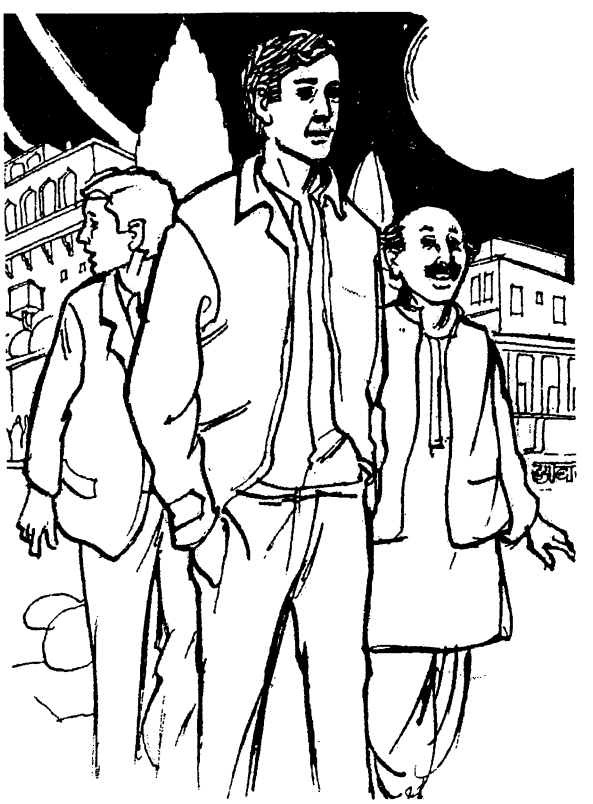

ছবিঃ আনন্দমেলা মে, ২০১৫ সংখ্যা থেকে নেওয়া।

অজানা দেশ, অচেনা পথ

সুনির্মল চক্রবর্তী

দেখতে দেখতে শরৎ হেমন্তের দিন ফুরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসল শীত। পাখিরা বাগানে আর গান গাইতে আসে না। ছোটাছুটি করে খেলতে আসে না পাড়া প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েরা। বাগান ঘিরে তখন জমাট হিমকণা আর তিনভুবনের ঠান্ডা বরফ। বরফ চারদিকের সবুজ ঘাসে জমে আছে। সেখানে ছুটে আসছে উত্তুরে হাওয়া। কিছু পরেই শিলাবৃষ্টি এসে হাজির। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বরফশিলা ঝরে পড়ছে।

ঘরে ছেলেটির মা বলছে, এ রকম আবহাওয়া বেশিদিন চলতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পরিবর্তন হবে।

বাইরে কনকনে শীতের রাত। ওদিকে মা-র চোখ তার অসুস্থ ছেলেটির দিকে। ছেলেটি যদি না বাঁচে, তবে সে কার আশায় বাঁচবে ? ছেলেটির বাবাও নেই, অনেক কাল আগে ওর বাবা গত হয়েছে। এখন এই ছোট্ট ঘরে অনেকদিন ধরে আছে এই ছেলেটি আর তার মা। খুবই গরিব ওরা। মা ও ছেলেটি ক'দিন ধরেই উপবাসে আছে। কেউ তাদের দেখার নেই। এ পাড়ায় তারা খুব উপেক্ষিত। কেউ তাদের খবর রাখে না। খবর রাখার চেষ্টাও করেনা।

ছেলেটির মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। চোখ দুটো খোলা নেই। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে শ্বাস বোধহয় পড়ছে না। মায়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক সে সময় বন্ধ দরজায় কে যেন টোকা দিল। মা ভাবল, এই অসময়ে আবার কে এল ! বাইরে যা ঠান্ডা !

দরজা খুলতেই একটা বুড়ো তার মুখ বাড়াল। ছেলেটির মা কিছু বলার আগেই বুড়ো ঘরে ঢুকল। অনুমতি নেবার যেন প্রয়োজন নেই। কী আশ্চর্য, বুড়োর গায়ে তেমন জামাকাপড় নেই, ওর কি ঠান্ডা লাগে না ?

বুড়ো কাছে আসতেই ছেলেটা যেন ঘুমিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ওর মা গিয়েছে পাশের ঘরে। বুড়োর জন্য কিছু গরম পানীয় করে আনবার জন্য । বুড়ো ছেলেটার দোলনায় হাত রেখেছে। ছেলেটিকে দোল খাওয়াচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি ছেলেটার।

ছেলেটার মা বুড়োকে বলছে, ঈশ্বর দয়াময়, তাই কি না ! নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে তিনি কেড়ে নেবেন না, তাই না ? বুড়োটা ওর কথার জবাবে হ্যাঁ বলছে নাকি না বলছে বোঝার উপায় নেই। ও কোনদিকে কোন খেয়ালে ঘাড় নাড়ল তা-ও বোঝা গেল না। ওই বুড়ো আসলে ছিলেন যমদূত। ছেলেটার মা বুড়োটার চোখে সরাসরি চোখ রাখতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে রাখল। চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে আর কিছুই মনে আসছিল না। গত তিনদিন চোখের পলক পড়েনি তার। জেগেই কাটাতে হয়েছে। আজ হঠাৎই ঘুম এল। ঘুমিয়েও পড়ল।

তারপর একসময় জেগে উঠল। কতক্ষণ এইভাবে ঘুমিয়ে ছিল তার মনে নেই। দোলনার দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল সে। দোলনায় তার ছেলে নেই। আর সেই বুড়োটাও। গেল কোথায় ? মনে হচ্ছে বুড়োটাই তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে। ছেলেটার মা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। দেয়াল ঘড়িটা এতক্ষণ টিক টিক করছিল। ঘড়িটাও এখন আর টিক টিক করছে না। কে যেন ঘড়িটাকেই থামিয়ে দিল।

এখনও বাইরে ঠান্ডা। জবুথবু হয়ে ঘরে বসে আছে

ছেলেটার মা। মা আর ঘরে থাকতে পারছে না। ছেলের জন্য কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে এসেই চোখে পড়ল কালো পোশাকের এক মহিলাকে। সে একা একাই হেঁটে বেড়াচ্ছিল। তার কোনো ভয়ডর নেই। তার নাম রাত্রি।

সে বলল তোমার ঘরে যমদূত এসেছিলেন, তিনিই তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছেন।

ছেলেটার মা কেঁদে বলল, তুমি শুধু বলে দাও কোন পথে গেছে। আমি ওকে খুঁজে বার করবই।

ছেলে-হারা দুঃখিনী মায়ের দিকে তাকিয়ে রাত্রির কষ্ট হচ্ছিল। রোজ সন্ধ্যায় রাত্রি চলে আসত ছেলেটার ঘরে। ওর মা গান শুনিয়ে ওকে ঘুম পাড়াত। গান শুনতে তার খুব ভালো লাগত। কতদিন মায়ের চোখে জল দেখেছে। আহারে বেচারি। এবারে সত্যি সত্যিই আরও দুঃখিনী হল।

রাত্রি বলল, আর দেরি কোরো না। এখনই যাও ডানদিকে। বাঁশবন ঝাউবনের ভেতর দিয়ে ছুটে যাও। ওখান দিয়েই ওকে যেতে দেখেছি।

মা তখনই ছুটে গেল। কিন্তু সেখানে পথ হারাল। অনেক পথ এসে মিলেছে সেখানে। বেচারি ভেবে পায় না কোন পথে যাবে। সামনেই কাঁটাগাছের ঝোপ। তাতে না আছে ফুল না আছে পাতা। ডালপালায় বরফের কুচি লেগে আছে।

দুঃখিনী মা কাঁটাগাছকে বলল, দেখেছ কি এক বুড়োকে যেতে ? সে আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। কোনদিকে গেছে বলতে পারো ?

কাঁটা গাছ বলল, বলতেই পারি। দেখতেই পাচ্ছ আমার ডালপালায় বরফের কুচি লেগে আছে। আমি ঠান্ডায় কাঁপছি। তুমি ডালপালা থেকে বরফ সরিয়ে দাও। তবেই আমি বাঁচব। আগে এটা করে দেখাও।

দুঃখিনী মা তখন ডালপালা থেকে বরফ সরাল। কাঁটাঝোপের তখন কি খুশি। নতুন পাতায় সব ডাল ভরে উঠল। ডালে ডালে ফুল ফুটল। কাঁটাগাছ তার কথা রাখল। ওকে পথ দেখিয়ে দিল।

পথে পড়ল মস্ত বড়ো এক দিঘি। দিঘির জলে জমাট বরফ। দিঘি পার হবে কি করে ? ভাবতে লাগল সে। ভাবতে গিয়ে কুলকিনারা পাচ্ছিল না।

দিঘি বলল, আমি খুব মুক্তো ভালোবাসি। তুমি আমাকে মুক্তো দিতে পারো ?

দুঃখিনী মা বলল, আমি কোথায় মুক্তো পাব ? আমার তো এই চোখদুটিই আছে।

—বেশ তো, কাঁদতে কাঁদতে চোখদুটিকে আমার বুকে গলিয়ে ফেলে দাও। তোমাকে যমদূতের বাড়ি পৌঁছে দেব।

দুঃখিনী মা তাই-ই করল। ছেলের জন্য এত কাঁদল, চোখ দুটো গলে গেল। জল পড়ে দুটো চোখ কি চমৎকার দুটো মুক্তো হয়ে গেল। দিঘি তার কলরোল থামাল। বরফ রাস্তা করে দিল। নিথর স্রোতের ওপর দিয়ে ভেসে সে দিঘি পেরিয়ে ওপারে গেল। কিছুদূর হেঁটে যেতেই এক আশ্চর্য বাড়ি। কিন্তু সে দেখতে পেল না। দুঃখিনী মা যে তার চোখ হারিয়েছে, দেখবে কি করে ?

হাঁটতে হাঁটতে সে এল মূল ফটকের কাছে। সেখানে এক পাহারাদার বুড়ি দাঁড়িয়েছিল। বলল, কি চাই ? কি করে এখানে এলে ?

দুঃখিনী বলল, আমার ছেলেকে চাই। ভগবানের ইচ্ছেতেই এখানে আসতে পেরেছি।

পাহারাদার বুড়ি বলল, যে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে, সে এখনও ফেরেনি। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। বাগানে এক একটা গাছ আছে তারাই একেকটি মানুষের প্রাণ। আহা-হা তুমি তো আবার দেখতে পাচ্ছ না, দুঃখিত। তুমি তোমার ছেলের খোঁজে এতদূর এসেছ দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। চলো তোমাকে বাগানের ভেতরটায় ঘুরিয়ে আনি।

দুঃখিনী-মা ঢুকল বাগান বাড়িতে। কত রকমের ফুল সেখানে। ফুলের গন্ধে বাগান ম ম করছে। কিছু ফুল এখনও তাজা, কিছু ফুল মিইয়ে আছে। সেখানে অনেক ছোটো বড় গাছ।

পাহারাদার বুড়ি দুঃখিনী মাকে ছোট গাছের সামনে এনে দাঁড় করাল। কি আশ্চর্য ! সেখানে অনেক ছোট গাছ ছিল, তবুও নিজের ছোট্ট ছেলের বুকের ধুকপুকুনি কানে গেল তার। চমকে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুটো ওকে ছুঁতে গেল। বুড়ি বলল, উঁহুহু, ফুল ছুঁয়ো না। যমদূত এল বলে। ও এলে ওর কাছে বলবে ও যেন এই সাদা ফুলটি তুলে না ফেলে। ওকে অনেক বলবে, কেমন ?

হঠাৎ একটা ঝড় উঠল সেখানে। চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে এল। হাওয়ারা তাদের গান থামাল। ফুলগুলি ভয় পেয়ে কেঁপে উঠল।

দুঃখিনী-মা বুঝল, এইবার যমদূত এসেছেন। ইতিমধ্যে পাহারাদার বুড়িও কখন সেখান থেকে সরে পড়েছে।

যমদূত তাঁর ভয়াল দুটি চোখে তাকালেন দুঃখিনীর দিকে। কেমন মায়া হল তাঁর। আহারে ! ওর যে দুটো চোখই নেই। বেচারি যে অন্ধ !

অন্ধ-মা হাঁটু গেড়ে বসল সেখানে। মৃত্যুকে বলল, হে দেবতা, ওই সাদা ফুলটি তুলে নেবেন না, ওকে রক্ষা করুন।

মৃত্যু-দেবতা বললেন, তা কি করে হয় ? আমি যে সর্বশক্তিমান বিধাতার আদেশ পালন করি। আমাকে আমার

কাজ করতে দাও। মৃত্যু-দেবতা তখন এক ফুঁ দিলেন। সব গাছ সব ফুল ভয়ে কেঁপে উঠল। মৃত্যু-দেবতা বললেন, আমার কাজ হল সদ্য বেড়ে ওঠা এইসব গাছ, ফুল, লতাপাতা স্বর্গের বাগানে গিয়ে রেখে আসা। সে দেশ কোথায়, কী করে সেখানে যেতে হয়, তা মানুষ জানতে পারে না।

দুঃখিনী-মা কেঁদে কেটে বলল, অতসব বুঝি না, আমার ছেলেকে তো ফিরিয়ে দিন।

মৃত্যু-দেবতা বললেন, তা হয় না। এটাই বিধাতার নিয়ম। তার বদলে তোমাকে তোমার চোখদুটো ফিরিয়ে দিচ্ছি। দিঘির জলে আমি সেটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

সত্যি সত্যিই দুঃখিনী-মা তার চোখ ফিরে পেল। সামনেই ছিল এক মস্ত কুয়ো।

মৃত্যু দেবতা বললেন, কুয়োর ভেতরে তাকাও।

চোখ গেল কুয়োর জলে। কুয়োর জলে ফুটে আছে মানব জীবনের ছায়া। জীবনের সুন্দর, অসুন্দর সব ছবি সেখানে ফুটে উঠছিল।

জীবনের আনন্দ, পাপ, দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভাগ্যের পরিণতি দেখছিল সে। তার মন কেমন স্থির হয়ে গেল। আর যেন চঞ্চলতা নেই। ছেলের কথাও সে যেন ভুলতে বসল।

দুঃখিনী মা বলল, এ কী করে সম্ভব ?

মৃত্যু-দেবতা বললেন, এ তোমার আমার ইচ্ছেই নয়, সর্বশক্তিমান বিধাতার এ এক অপূর্ব খেলা। তার ইচ্ছেই শেষ ইচ্ছে। তোমার ছেলের ভূত ভবিষ্যত অতীত সবই নিশ্চয়ই দেখতে পেলে ?

দুঃখিনী-মা বলল, আমার কিছুই আর বলার নেই। যা ভালো তা-ই করো। ছেলে এইসব দুঃখ দুর্দশা হাতাশা রোগ শোক দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাক। আমার সব কান্না আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

মুহূর্তেই দুঃখিনী-মা তার জ্ঞান চক্ষু যেন ফিরে পেল। দেখল সেখানে যমদূত নেই। মৃত্যু তার সামনে দাঁড়িয়ে নেই।

দুঃখিনী-মা শেষ বারের মতো হাঁটু গেড়ে বসল সেখানে। দয়াময়ের উদ্দেশে বলল, তোমার ইচ্ছেই সবার ইচ্ছে। তাই হোক হে দয়াময়। আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও হে দয়াময়-কথা বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ল সে।

মৃত্যু-দেবতা তাঁর আদরের ছেলেকে তখন নিয়ে চলেছে এক আজানা দেশে। বেঁচে থাকতে কেউ সে রাস্তায় হেঁটে যেতে পারে না।

(হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্প অবলম্বনে)

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

এই আমাদের পুরুলিয়ায়

এই আমাদের পুরুলিয়ায় ধম্‌সা-মাদল বাজে।
এই আমাদের পুরুলিয়া রানির বেশে সাজে।
এই আমাদের পুরুলিয়ায় নিবারণের ভাষা —
অরুণ ঘোষের টুসুর গানেই ধান কেটে যায় চাষা।

এই আমাদের পুরুলিয়ায় নাচে-গানে সবে
মেতে থাকে বারো মাসের বাহান্ন উৎসবে।
এই আমাদের পুরুলিয়ার স্বাধীন পুণ্যভূমি —
আসতে পারো এই প্রকৃতির কোলের মাঝেও তুমি।

এই আমাদের পুরুলিয়ায় ছৌ-ঝাঁপানের মেলা —
এসো সবাই সিনান করি, দিই ভাসিয়ে ভেলা।
পুরুলিয়ার অঝইদা আর পঞ্চকুটের ছবি
বন্ধু, তোমায় করবে পাগল, তুমিও হবে কবি।

যতই মোদের অবহেলায় দেয় সরিয়ে ওরা
পাখির ডাকে ভোর হয়ে যায়, আকাশ উজল-করা।
নামের মালা গলায় পরে পুরুলিয়ার মাটি —
খরার দেশেও জীবন আছে, মা'র গরবে হাঁটি।

গানের এ দেশ ভরায় প্রাণের নদী বানের জলে।
ঝুমুর-দেশেও আছেন কবি গর্বে, মনের বলে।
পদ্য লেখো, ছবি আঁকো, গান গেয়ে যাও সুখে।
পুরুলিয়ার অহঙ্কারের বাজুক শপথ বুকে।

আমরা যারা ছোট্ট তারা এই সময়ের থেকে
এই মাটিরই গাইবো গাথা, শোনাবো প্রত্যেকে
এই মাটিতেই প্রাণ পেয়েছি, জীবন বড়ো করে
পুরুল্যা মা'র করবো পুজো এই পৃথিবীর ঘরে।

ছোটদের পাতা

শক্তিপাড়ার ভূত

প্রবাহনীল দাস

(প্রথম শ্রেণি)

একটি গ্রাম ছিল, সেই গ্রামে একটি পাড়া ছিল এবং সেই পাড়ার নাম ছিল শক্তিপাড়া। অনেক বছর আগে একজন ওই পাড়ায় থাকতেন। তিনি টেকো ছিলেন এবং তাঁর বাড়ির পাশে ছিল এক বেলগাছ। একবার তিনি একটি কাজে বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছিলেন এবং তখন সেই বেল গাছ থেকে দুটো তিনটে ভারী বেল তাঁর মাথায় পড়ে। সেই সময় তিনি বাড়িতে ঢুকে পড়েন। তিনি অনেক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এবং কিছুদিন পরেই মারা যান। পাড়ার সব লোকই তখন বিশ্বাস করতে লাগলো যে তিনি নাকি সেই বেল গাছেরই ওপর-এ বসে শক্তিপাড়াকে সুরক্ষিত রাখেন এবং এই কথা সত্যি কথা। একবার শক্তিপাড়ায় রাত্রি বেলা চোর ঢুকেছিল। সেই সময় ভূত বাবু ছুড়েছে যে বেল, সেই বেলের ধাক্কা খেয়ে চোর বাবু ঘায়েল। তারপর সবাই ছুটে এল। তারপর চোরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। পরদিন ভূতের জন্যে সারটিফিকেট বানানো হল। কিন্তু ভূতকে তো আর তা দেওয়া গেল না, সেই জন্যে সেটা বেলগাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই সারটিফিকেট -

"আমাদের প্রিয় শক্তিপাড়ার ভূত, আমাদের চোরের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ তোমাকে।"

পাখি

সোহিনী নন্দী (১ম শ্রেণি)

পাখিরা সব বাসায় থাকে
আমরা থাকি ঘরে,
পাখিরা সব কত রঙিন
আকাশ ভরে ওড়ে।

পুরনো ঘরের রহস্য

অনমিত্র দেওঘরিয়া

(২য় শ্রেণি)

অনেক দিন আগেকার কথা। এক রাজা তার ঘরে একটা হিরে রেখেছিল। একদিন রিজু নামের একটি ছেলে মাঠে খেলছিল। হঠাৎ তার ফুটবলটা ওই পুরনো রাজার ঘরটায় চলে গেল। রিজু সেই ঘরটা দেখতে পেল। সেই ঘরে একদিন একটা চোর ঢুকে সেই হিরেটা দেখতে পেল। রিজু সেদিন খেলতে গিয়ে আবার সেই ঘরটায় গেল। চোরেরা সেই ঘরে বসেছিল। রিজুকে তারা দেখতে পেল। চোরগুলো রিজুকে তাড়া করল। রিজু দৌড়াতে দৌড়াতে বাইরে এল। কিন্তু চোরটা পড়ে গেল। আরেকটা চোর তাকে তাড়া করল। কাছে একটা তালগাছ ছিল। রিজু একটা পাথর দিয়ে একটা তাল মাটিতে ফেলে দিল। সেই তালটা ঐ চোরটার মাথায় পড়ল এবং চোরটা মাটিতে বসে গেল। সেই চোরটার হাতে ছিল রাজার হিরে। রিজু এবার সেই হিরেটা কেড়ে নিল। তারপর ঘরে চলে এল। তার বাবা সেই হিরেটা নিয়ে পুলিশ কাকুর হাতে জমা করে দিল।

গাছ

সন্দীপকুমার মাহাত

(সপ্তম শ্রেণি)

গাছ আমাদের বাঁচায় প্রাণ,
গাছ করে আমাদের জীবন দান,
ফলমূল করে প্রদান।
গাছ লাগানো আমাদের কর্তব্য
এটাই তো আমাদের মন্তব্য।
গাছ উঠে মাটি ভেদ করে
যদি গাছ না থাকে,
তাহলে আমরা যাব মারা।
তাই বলি গাছ বসাও
আর নিজেদের প্রাণ বাঁচাও।

আমার ভাবনা

তনুব্রত সরখেল

(কে জি-টু)

পাখি উড়ে উড়ে যায়।
আকাশে রঙের খেলা।
৪/৫ দিকে পাখি উড়ে যায়।
মা তুমি পৃথিবীর থেকে বড়।
আমার থেকে বড়।
তোমাকে আমি খুব ভালোবাসব।
মা দুর্গার ১০টি হাত।
মা দুর্গার বাহন সিংহ।
শিবের বাহন ষাঁড়।
বাবা তুমি অনেক ভাল।
তুমি আমায় পুরি নিয়ে যাবে।

ভারতমাতা

দেবার্পণ ঘোষ

(ষষ্ঠ শ্রেণি)

ওগো ভারতমাতা
তুমি আমাদের প্রাণ
ওগো আমাদেরই প্রাণ।
তোমার জন্য অনেক বীর
দিল বলিদান।
যত তোমার শত্রু আছে
করি তাদের নাশ
যতই তারা ফন্দি পাতে
হয় সর্বনাশ।

ছবি আঁকার ক্লাস

অবি সরকার

নানির ছবি আঁকার ক্লাসে মাঝে মধ্যে নাড়ুকুড়ু উদিত হন। ড্রইংখাতা, প্যাস্টেল বক্স, পেন্সিল, রবার, বোর্ড সব কিছু নিয়ে বেশ মনোযোগী ছাত্রর মতো সবার মধ্যে এসে জাঁকিয়ে বসেন। নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীরা ওকে বেশ সমীহ করে। আন্টির নাতি বলে কথা। ও নিজেও কি তেমন কিছু ভাবে নাকি ? অথচ হাজার বলা সত্বেও নিয়মিত ক্লাস করতে আসবে না। মর্জি হল তো এলেন, কিছুক্ষণ জ্বালাতন করে চলে যাবেন।

আজও এলো। বেশ গুছিয়ে ছবি আঁকতে বসল। একটু যারা বড়, তাদের জন্য 'স্টিল-লাইফ' সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে আঁকার জন্য। নাড়ুকুড়ু যেমন খুশি না এঁকে, সেই 'স্টিল-লাইফ' আঁকতে বসল। এই ব্যাপারে আন্টি অর্থাৎ নানি কোনো বাঁধা দেন না। উৎসাহও দেন না। জানেন, ও ওর মর্জি মাফিক কাজ করবে।

সবার আগে ও কাজ শেষ করল। বড়রা পেন্সিল ড্রইং করে আন্টিকে দেখিয়ে শুধরে নেয়, তারপর রং করে। ওর সেসব বালাই নেই । ওস্তাদিয়া ভঙ্গিতে উবু হয়ে, নীল ডাউন হয়ে, সোজা বসে, কাতো যে কসরত করল তার ইয়ত্তা নেই। বড়দের কারো কারো খাতাতে পা তুলে দিল, কারো গায়ে হেলান দিয়ে প্যাস্টেল ঘষল। এবং সবার আগে শেষ করে নিজেই ঘোষণা করল -ফাস্ট, নানি দেখ।

ছোট এক ছাত্রী, ওরই বয়সি, সে খলবলিয়ে উঠল, আন্টি বলতে পারিস না ? ক্লাসে কেউ নানি বলে ?

ভ্রূ কুঁচকে নাড়ুকুড়ু দেখল তাকে। কি স্পর্ধা। ওকে জ্ঞান দিচ্ছে ঐ পুঁচকে মেয়েটা।

নাড়ুকুড়ু খাতাটা নানির পাশে রেখে, ছাত্রীটির খাতায় ঝুঁকে বলল, দেখি কি বানালি। এটা কি ?

মেয়েটি বলল, গাছ। গাছ চিনিস না ?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নাড়ুকুড়ু বলল, গাছের তলায় এগুলো কি ?

মেয়েটি বলল, উপরে জল নীচে ঘাস। ঘাস চিনিস না ?

— তা'লে গাছটা জলে খাড়ু হয়ে থাকে কি করে। গাছ তো মাটিতে থাকবে। তাছাড়া গাছ অতো মোটা আর বাঁটুল হয় কি ? কি গাছ ওটা ? রোগা করে আঁকতে পারিস না ? পাতাগুলো কি হয়েছে ? পাতা না মেঘ ? গোল গোল করে বেড় দিলেই হল ? আকাশ কই ? অতো বড়ো পেটমোটা

গাছে পাখি নেই কেন ? মটকু গাছে কি পাখি থাকে না ?
মেয়েটা প্রায় দিশাহারা। বলল, যা তুই, তোকে আমি দেখাবো না।
নানি বললেন, পাবলো, কাউকে ডিস্টার্ব করোনা। যার কাজ তাকে করতে দাও। তুমি তোমার কাজ কর।
নানি একজনের কাজ দেখছিলেন। পাশে যে নাড়ুকুড়ু ওরফে পাবলো খাতা রেখে এসেছে খেয়াল করেন নি। নাড়ুকুড়ু বলল, শুনতে পেলেনা, আমি ফাস্ট, কখন 'লাইফ' শেষ করে দিয়েছি।
নানি চমকে উঠলেন। বড়রা হৈ হৈ করে হাসল। সেই হাসি দেখো ও নিজেও হা হা করে হাসল, কেন কে জানে।
নানি ওর খাতা দেখে অবাক হলেন। পোটমোটা একটা ব্রাউন ফ্লাওয়ার ভাসের মধ্যে, মানিপ্লান্টের চারটে পাতা সহ লতানে ডগাটা ঝুলছে। পেছনে হলুদ রং-এর ড্র্যাপারি। এ ছবি ঐ পাঁচ বছরের পাবলো এঁকেছে ? নানি খুশি হয়ে বললেন, খুব সুন্দর হয়েছে। ভেরি গুড —
—তা'লে খাতায় স্মাইল এঁকে দাও।
নানি ভেরিগুড লিখে, স্মাইল এঁকে দিলেন। সর্বনাশ হল এরপরই। নানি বললেন, এবার নিজের ইচ্ছে মতো ছবি আঁকো।
—আমার হাত ব্যথা করছে। আমি দেখি —
—কাউকে ডিস্টার্ব করো না।
নাড়ুকুড়ু বড়দের এক এক জনের কাছে গিয়ে বসে আর কথার তুবড়ি ফুটতে থাকে। —জানিস তো, ঘটের মধ্যে জল আছে। সেটা কি করে খাতায় বানাবি ? তুই জল রং করবি তো ? আঁকা হয়ে গেলে ঐ বাটির জল ঘটের মধ্যে ঢেলে দিবি - নইলে মানি প্লান্ট মরে যাবে।
দাদাটি বলল, ঠিক আছে যা, কাজটা হোক আগে।
—এত দেরি করে করিস কেন ? আমার কখন হয়ে গেল। আমাকে জলরং দেয়নি। ইস্, ঘটে জল না দিলে গাছটা মরে যাবে।
আর একজনের কাছে গিয়ে ও হতাশ হয়ে বলল, ঘুমোচ্ছিলি ? এখনো পেন্সিল নিয়ে আঁকিবুকি কাটছিস ? রং ফেলবি কখন ?
—পাবলো কথা বলোনা। ওদের কাজ করতে দাও। একটি বাচ্চাকে কাজ দেখাতে দেখাতে বললেন নানি।
—ইরিব্বাস, করেছিস কি ? ঘটি এঁকেছিস, নাকি তুবড়ির খোল্। ওতে তো এককাপ জলও ধরবে না। আর অতোবড় পাতা ? এখুনি ঘট উল্টে পড়ে যাবে পাতার ভারে। ব্যাস, ঘটি ভেঙ্গে খান্ খান্ - মেঝের জলে করবি চান। হা হা হা— পাবলো ! ধমক দিলেন নানি। — ঘটি, ঘটি করছ কেন ? ভাস্ বলতে পারছনা ? তারপর সেই ছেলেটির খাতা দেখে বললেন, যথেষ্ট বড় হয়েছ, অনেকদিন কাজ শিখছ। এতটুকু চোখ তৈরি হল না ? প্রথম পাতা, দ্বিতীয় পাতা এবং তৃতীয় পাতার অর্ধেক নিয়ে ভাসটা। আর তুমি আঁকলে প্রায় একটা পাতার সমান ভাস। কোথায় ঝুলছে প্লান্টের ডগা, আর কোথায় তোমার ভাস। মোছো, ঠিক করো সব। পাবলো, তুমি বসে আঁকো কিছু —
—কি আঁকবো ?
—সাইকেল আঁকো। নানি জানেন, ও সাইকেল আঁকতে পারে না, কিন্তু সাইকেল ওর প্রিয়। অতএব সময় লাগবে। চুপ থাকবে।
মিনিট পাঁচেক খাতার সঙ্গে কুস্তি করে খান্তি দিয়ে বলল, বানিয়েছি। কিন্তু রং হবে না। রং উঠে গেছে সাইকেলের।
এবারেও চমক। সাইকেলে চলে যাচ্ছে একটা মানুষ। তার ভঙ্গিটি অসাধারণ। সাইকেলটার শুধু রং নেই তা নয়, খুব পুরোনোও বটে। কিন্তু চলছে দারুণ। নানি খুশি হয়ে বললেন, এবারও গুড পেলে।
—ভেরি গুড হয়নি ?
—আচ্ছা, ভেরি গুডই দিলাম। সোনা ছেলে। প্রতিবার কেন ক্লাস করনা। তাহলে আরো ভালো হত।
—আমরা জানি, ও যত ছবি আঁকে তার চেয়ে গল্প বানায় বেশি। ওর সব ছবির পেছনে গল্প আছে। অথবা গল্পের পেছনে ছবি আছে। অথবা এমনও হতে পারে, ছবি যাতে বানাতে না হয় তাই গল্প বানায়। ভেরিগুড পাওয়াতে সেই মোটা গাছের শিল্পী মেয়েটি বলল, কই, খাতাটা দেখি, কি বানালি ?
নাড়ুকুড়ুবলল, ছবি বানায় না আঁকে, বুঝলি ?
—তুই তো আন্টিকে বলেছিলি, বানিয়েছিস, তার বেলা ?
বলতে বলতে খাতাটা টেনে নিয়েছে সে। এক নজর দেখেই বলল, এমা, এমন রোগা করে বানিয়েছিস কেন ? মানুষ কখনো এমন সরু হয়না। ভাঙা ইঁটের রাস্তা পেরিয়ে ও এলো কি করে ?
—কে বলেছে ও ভাঙা ইঁটের রাস্তা পেরিয়ে এসেছে ?
—চাকাগুলো আর গোল নেই। ট্যাপা হয়ে গেছে। কি করে হয় ? এবোর খোবর রাস্তা হলে অমন হয়। ও নিশ্চয়ই শিবতলার রাস্তা পেরিয়ে এসেছে।
—কেন, শিবতলা থেকে আসবে কেন ? নাড়ুকুড়ু প্রতিবাদী।
—নতুন রাস্তা হবে যে, ভাঙা খোয়া ইঁট পড়েছে।
নাড়ুকুড়ু নানিকে বলল, ভাঙা ইঁট আঁকবো নানি ?
—না, যা এঁকেছ, সুন্দর হয়েছে। আর কিছু করোনা।
—ছুটি ছুটি ছুটি —
—চুপ করে বসে দ্যাখো। এরপর আবৃত্তির ক্লাস আছে।
নাড়ুকুড়ু আবার এক একজনের পাশে বসে, খাতার উপর

মাথা ঝুঁকিয়ে দেখে। —জঙ্গল বানালি ? বাঘ কই, জিরাফ ? সজারু ?

জঙ্গল কেন, এটা পুকুর পাড়। পুকুর ধারের গাছ, দূরের মাঠ—

—এতো কালো মেখেছিস, মনে হচ্ছে গভীর বন। আলো ঢোকে না। গাছের পাশে ভূতের বাসা বানালে জঙ্গলের পাখি ভয়ে উড়ে যায়।

—ওটা ভূতের বাসা না। খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি ঝুলছে। পাখি এসেছে সেই রস খেতে।

—অতোগুলো গাছ কেটে জলে ফেলেছিস কেন ? জানিস না গাছ কাটা খুব খারাপ অসুখ। আমাদের বাড়ির চারপাশ এত জঙ্গল এই জন্যই। কাটেনা কেউ। নানাজী বলে, একটা গাছ হল একটা প্রাণ। প্রাণ কি তুই জানিস ? আমি জানিনা।

—পান করা মানে জল খাওয়া, মেয়েটা বলল, ও গুলো গাছ কেন হবে। ওগুলো ঘাটের সিঁড়ি।

—সেই সিঁড়িতে বাঁদর লাফাচ্ছে ? বেশ করেছিস। তুই মানুষ আঁকতে পারিস না আমি জানি। মানুষের বদলে বাঁদর আঁকলেও ঠিক চলে যাবে। আমরা যখন মানুষ থাকতাম না, তখন বাঁদর থাকতাম। তখন খুব লাফাতে পারতাম। ছোটবেলায় লাফাতে লাফাতে বলতাম, হুঁক্কু ডিডা, হুঁক্কু ডিডা—

মেয়েটা ওর ভাষণ শুনতে শুনতে কখন খাতার পাতা উলটে নতুন পাতা সাজিয়ে নিয়েছে। নাড়ুকুড়ু দেখে বলল, পুরোনো করে দিলি।

—কি যে বলিস মানে বুঝি না। মেয়েটা বলল।

—মানে, মুছে ফেললি ছবিটা ? আবার সাদা কাগজ হয়ে গেল তো। আগের মতো।

—তুই যা তো। আমার কাজ হচ্ছে না।

—কি বানাবি তুই এখন ?

—ভাবছি, মেয়েটা পেন্সিল মুখে দিয়ে ভাবতে লাগল।

—আমি বলব ? একটা শৌচালয় আঁক। যেখানে ভাবনা, শুনিসনি, ভাবলেই দেখবি শৌচালয়। বেশি ভাবিস না। বরং একটা গল্প বলি, তুই ছবি বানাতে পারবি।

—কি গল্প, বল শুনি। মেয়েটা বলল।

নাড়ুকুড়ু বলল, তাপ্পর তো ঝড় আর বিষ্টি। রাস্তা ডুবে গেল। আমি কাগজের নৌকো করে যাচ্ছি। ঝিলিক মেরে বিজ্যুট্ চমকালো। হুড়ুম করে বাজ পড়ল। সে তো নাই।

—সে কে ? মেয়েটা প্রশ্ন করে।

—পরে জানবি। আমি নৌকোকে বললাম, তা'তাড়ি চলো। তাপ্পর সে এলো। কি ভীষণ দিশ্য। তাই দেখে বাঘ হাতি সব পট্ করে মরে গেল। তাই দেখে আমার একটা আইডিয়া এলো।

নাড়ুকুড়ু চুপ। মেয়েটা বলল, কি আইডিয়া ?

নাড়ুকুড়ু বলল, নৌকোটার দু'পাশে যদি পাখনা বানিয়ে নেওয়া যায়, তা'লে ফুস করে উড়ে যেতে পারে মেঘের দেশে। যেখান থেকে মেঘ আর বিজ্যুট আর মেঘের বোম্ ফাটে।

—ছবি কোথায় ? মেয়েটা প্রশ্ন করে।

—কিসের ছবি ?

—বারে, ছবি আঁকার গল্প দিবি বললি যে —

নাড়ুকুড়ু অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুই ম্যাজিক জানিস ?

মেয়েটা বলল, না। পাশের একটা ছেলে প্যাস্টেল ঘষতে ঘষতে বলল, ভ্যানিশিং রং দিয়ে ম্যাজিক পেন্টিং করা যায়। বাড়িতে আছে। এখানে আনলে আন্টি বকবেন।

নাড়ুকুড়ু বলল, নানি, ম্যাজিক রং আছে ?

—না। নানির সংক্ষিপ্ত জবাব।

হঠাৎ চেঁচিয়ে নাড়ুকুড়ু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, আইডিয়া, টিয়াপাখির কি রং বলতো ?

সবাই কোরাস গাইল - সবুজ।

আন্টি ধমকে বললেন, পাবলো, তুমি ওপরে যাও। তোমার ক্লাস হয়ে গেছে - ছুটি।

নাড়ুকুড়ু গ্রাহ্য করলনা। বলল, টিয়াপাখির গায় যদি সাতরঙের জামা পরানো হয়, তখন সে কি আর টিয়া থাকে ? সে তখন ঝুলনটিয়া হয়ে যায়। লম্ফটিয়া হলেই বা কে আটকায় ? এটা ম্যাজিক হল না ? ছিল সবুজ টিয়া, হয়ে গেল লম্ফটিয়া। আরো হয়। ধরো, কাক। কাক কত রকম ? দাঁড় কাক, পাতি কাক, কালো কাক, সাদা কাক, নীল কাক, লাল কাক, —

একটা বড় ছেলে ধমক দিল। চুপ, একদম চুপ। বাজে বক বক একদম করবি না।

নাড়ুকুড়ু এমন ধমক খায়নি কখনো। ও ক্লাস থেকে সোজা বেরিয়ে উপরে গেল। আধঘন্টা পরে একটা ড্রয়িংখাতা এনে আমার সামনে মেলে ধরে বলল, এইটা কাক ছিল। আমি রং করেছি। লাল কাক হল কি না ? এটা কেউ নীল রং করে দিলে নীল কাক হবে তো ?

আমি বললাম, অবশ্যই। হতেই হবে।

খাতাটা নিয়ে সেই ছেলেটার সামনে ধরে বলল, যা জানিস না তা বলিস না। তুই কাক চিনিস ? এই দ্যাখ লাল কাক কেমন করে হয়। এমনি করে নীল কাক সবুজ কাক সব হয়। কিছুই শিখতে পারলি না। তই একটা ভুশুন্ডিকাক।

নানি ধমক দিতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই নাড়ুকুড়ু খাতা বন্ধ করে উঠে বেরিয়ে গেল।

কাঞ্চনপুরের ডাইনি

অনন্যা দাশ

তমালের পীড়াপীড়িতে আমি ওদের গ্রাম কাঞ্চনপুরে গিয়েছিলাম। তমাল আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন, আর অনেকদিন ধরে বলছিল ও। আসলে ও অনেকবার ছুটিতে আমাদের কলকাতার বাড়িতে এসে থেকেছে অথচ আমি কখনও ওর বাড়ি যাইনি তাই এবার আর না করতে পারলাম না। গরমের ছুটি পড়ার পর গেলাম ওদের ওখানে। কাঞ্চনপুরে এখনও সবুজ রয়েছে, কেটে ছেঁটে নির্মূল করে দেওয়া হয়নি। দেখলে মন জুড়িয়ে যায়, কি শান্ত নিরুপদ্রব। সাইকেল করে ওর বাড়ি যেতে যেতে সেটাই বললাম তমালকে। ও আমার জন্যে একটা সাইকেল নিয়ে স্টেশানে এসেছিল। মালপত্র তেমন কিছু আনিনি তাই সাইকেলে অসুবিধা হল না।

আমার কথা শুনে তমাল বলল, "তুই যদি এই কথাটা ছমাস আগে বলতিস তাহলে আমি বলতাম একদম ঠিক বলেছিস। কিন্তু এখন তো আর সেটা বলা যাবে না।"

"কেন ? কি হয়েছে এখন ?" আমার কান খাড়া হয়ে গেল।

"আর বলিস না ! এখানে এক উদ্ভট উপদ্রবের উদয় হয়েছে।"

"কি রকম উপদ্রব শুনি ?"

"ডাইনি ! কাঞ্চনপুরে এক ডাইনি এসেছে !"

"ধুস ! কী সব আজে বাজে কথা বলছিস ! ওগুলো তো কুসংস্কার ! ডাইনি আবার সত্যি হয় নাকি ?"

"আমিও মানতাম না জানিস কিন্তু এমন সব ঘটনা ঘটে চলেছে যে আমিও আর না মেনে পারছি না, চল বাড়ি গিয়ে তোকে সব বলব।"

আমাকে দেখে মাসি মেসো ভারি খুশি। তমালের মুখে আমার কথা শুনে শুনে ওরা যেন আমাকে চিনেই ফেলেছেন প্রায়। হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে মুড়ি চানাচুর নারিকেল খেতে খেতে তমাল বলল, "সত্যি খুব শান্ত আর নিরুপদ্রব জায়গা ছিল কাঞ্চনপুর। এখনকার যিনি সব চেয়ে বড়লোক সেই যশোদানন্দনবাবু এখানকার জন্যে অনেক কিছু করেছেন। স্কুল হাসপাতাল ইত্যাদি তাই আর পাঁচটা গ্রামের মতন আমাদের কথায় কথায় শহরে ছুটে যেতে হতনা। কলেজটা অবশ্য নেই তাই স্কুল শেষ করার পর সবাই শহরে পড়তে যায় আমার মতন। তবে এখনকার স্কুলটা বেশ ভাল, ভাল রেজাল্টও হয় বলে কলেজে অ্যাডমিশন পেতে অসুবিধা হয় না। যশোদাবাবু তো কলেজ করার কথাও ভাবছেন, দেখা যাক কি হয়। যাই হোক, যে প্রসঙ্গে বলছিলাম, ছমাস আগে হঠাৎ একদিন এক মহিলা এখানে থাকতে এলেন। বুঝতেই তো পারছিস ছোট জায়গা। সবাই সবাইকে চেনে তার মধ্যে একজন আগন্তুক এসে পড়লে কেউই খুব একটা ভাল ভাবে নেয় না। তবে কেউ যে আপত্তি করল তাও না। রমেশ মন্ডলের বাড়িটা খালি পড়ে ছিল উনি মারা যাওয়ার পর থেকে। ছেলেরা সব কলকাতা দিল্লিতে সেটেল করে গেছে। ভদ্রমহিলা বললেন ওনার নাম কমলিকা সেন ও উনি নাকি ওই বাড়িটা কিনেছেন। সেই থেকে ওখানেই রয়েছেন। কারো সাথে মেশেন না, বলেন উনি নাকি একা থাকতে চান। পুজো অনুষ্ঠান ইত্যাদিতেও যোগ দেন না। কেউ নিমন্ত্রণ করলে ভদ্র ভাবে না করে দেন। সত্যি বলতে কী ওনাকে বাড়ির বাইরে কেউই খুব একটা দেখে না। একজন বয়স্ক কাজের লোককে নিয়ে

এসেছেন, তার নাম ভোলেরাম। সেও খুব একটা কথা টথা বলে না, মুখ বন্ধ করে বাজার হাট করে। ওনাদের সম্পর্কে কেউই কিছু জানতাম না। আর আমি তো কলেজ নিয়ে ব্যস্ত আমার ওই সব উটকো লোক নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও ছিল না কিন্তু তারপর থেকেই গন্ডগোলটা শুরু হল। ওনার পাশের বাড়িতে থাকতেন সুধাকর পাত্র। বলতে নেই কিন্তু উনি যে প্রচন্ড বদমেজাজি আর ঝগড়ুটে প্রকৃতির লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুধাকরবাবু করেছিলেন কি রমেশবাবুদের বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে থাকার দরুন ওনাদের জমির কিছুটা অংশ নিজের করে নিয়ে পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন। রমেশবাবুদের বাগানে বেশ কয়েকটা ফলের গাছ আছে সেগুলো থেকে নিয়মিত ফল নেওয়াও ছিল ওনাদের অভ্যাস। ছেলেগুলোকে পাঠিয়ে দিতেন মাঝে মাঝেই পাশের বাড়ির বাগান থেকে ফল নিয়ে আসতে। যতদিন বাড়িতে কেউ ছিল না সেটা নিয়ে কেউ কিছু বলতে আসত না, কিন্তু কমলিকা দেবী দেখে ফেলতে ভয়ানক রেগে গেলেন। ভোলেরামকে সুধাকরবাবুর বাড়িতে পাঠালেন। সে বলল, এবার ফল নিয়েছেন নিয়েছেন কিন্তু এর পর যদি আপনার ছেলেরা আমাদের বাগানে ঢুকে তাহলে মেমসাহেব পুলিশ ডাকবেন। ব্যাস আর যায় কোথায়। সুধাকরবাবু খেপে গিয়ে প্রচুর চিৎকার চেঁচামেচি করলেন। ওমা এক সপ্তাহ বাদে ওনার ছেলেমেয়ে গিন্নির সাথে তাদের মামার বাড়িতে গিয়েছিল, সুধাকরবাবুই বাড়িতে একা ছিলেন তখন বাড়িতে আগুন লাগে। সব কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যায় এবং সুধাকরবাবু সেই আগুনে পুড়ে মারা গেলেন। তখন গ্রামের সবাই টানটান হয়ে বসল। কমলিকা দেবীকে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না, সুধাকরবাবু সিগারেট খেতেন। পুলিশের ধারণা শোবার সময় সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েন তাই ওই আগুন ধরে যায়। এই ঘটনাটা ঘটেছিল দু'মাস আগে তারপর পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের জন্যে চাঁদা চাইতে ওনার বাড়িতে হাজির হয় বঙ্কু। বঙ্কু গ্রামের মস্তান। পড়াশোনা বিশেষ করেনি কিন্তু সব হুজুগে সে প্রথম। আড্ডা ক্লাব এই সব নিয়েই থাকে। দিব্যি ছলে বলে কৌশলে লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে। সে হেন বঙ্কু ওনার কাছে চাঁদা চাইতে গেল। উনি একশো টাকা দিয়ে বললেন, আমি এর বেশি আর দিতে পারব না!

বঙ্কু নাছোড়বান্দা, সে পাঁচশো টাকা নিয়েই ছাড়বে। কথা কাটাকাটি হল দু'জনের মধ্যে। দু'দিন পর ভদ্রকালী মন্দিরের পাশের খাল থেকে বঙ্কুর মৃতদেহ উদ্ধার হল। তারপর থেকেই কমলিকা দেবীকে ডাইনির খেতাব দিয়ে দিয়েছে কাঞ্চনপুরের লোকজন। রাতে নাকি ওনার বাড়ি থেকে বিভৎস চিৎকার শোনা যায়। হরেক রকম গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। উনি নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিক করেন, মুর্গি বা অন্য ছোট জন্তু বলি দেন ইত্যাদি। একটা কুচকুচে কালো তিন পেয়ে বিড়াল আছে, ওই রকম কেউ যে ভালবেসে পুষতে পারে সেটাই আমার জানা ছিল না!

সব শুনে আমার তো মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। আমি বললাম, "হুঁ!"

ঠিক তক্ষুনি ওখান দিয়ে একজন ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। ঝকঝকে চেহারা, পরনে জিন্স আর টি শার্ট। ওনাকে দেখে তমাল লাফিয়ে উঠে বলল, "পলাশদা! এই আমার বন্ধু ইন্দ্র। আমরা এক সাথে পড়ি। ওকে অনেক বলেকয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। এবারে ও যাতে বোর না হয় সেটা দেখা আপনার দায়িত্ব!" তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "পলাশদা বছর দুয়েক হল আমাদের এখানে এসেছেন। উনি লেখক। মানে গল্পের বই টই নয় মোটা মোটা সব মনস্তত্ত্বের বই, এখানে থাকলে শান্ত পরিবেশে নাকি ওনার লিখতে সুবিধা হয়। আমাদের তাতে লাভ হয়েছে আমরা ওনার সঙ্গে পাই।"

পলাশদা আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "তোমরা চলে এসো আমার ওখানে একদিন তারপর না হয় গল্প টল্প করা যাবে। বেড়াতেও যাওয়া যেতে পারে। ওকে সাহেব বাড়িটা দেখাতে নিয়ে যেতে পারি কালকে। আজ আর বসব না একটু তাড়ায় আছি। ঠিক আছে আসবি যখন একটু ফোন করে জানিয়ে দিস তাহলে বাড়িতেই থাকব।" বলে পলাশদা চলে গেলেন।

অমল বলল, "খুব মাই ডিয়ার লোক, উনি যে সাইকোলজির ছাত্রদের জন্যে অত মোটা মোটা বই লেখেন বোঝাই যায় না।"

খাওয়া শেষ করে আমি বললাম, "চল একটু ঘুরে আসি।"

"আজ থাক সাহেব বাড়ি যেতে এক ঘন্টা ফিরতে এক ঘন্টা রাত হয়ে যাবে।"

"না, না, আমি তো কাঞ্চনপুরের ডাইনির বাড়িটা একবার দেখতে যাব ভাবছিলাম।"

"উফফ্ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। এত জায়গা থাকতে তুই কিনা ডাইনির বাড়ি দেখতে চাস।"

"হ্যাঁ, তুই যা গল্প শোনালি তারপর তো ওটাই দেখতে ইচ্ছে করছে।"

সাইকেল নিয়ে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে কিন্তু একেবারে রাত হয়নি।

বাড়িটায় আহামরি কিছু নেই, সাধারণ একটা দোতলা বাড়ি। সামনের বাগানে যত্নের অভাবে আগাছা, তবে কিছু ফুল গাছও রয়েছে, রাতে ফোটা ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ওনার কাজের লোক বাড়ির কাজ সামলে আর বাগানের কাজ করে উঠতে পারছে না। বাড়ির পিছনের দিকে বেশ কিছু বড় বড় গাছ। ওগুলোই সব ফলের গাছ যা নিয়ে সুধাকরবাবুর সাথে বিতর্কের সূত্রপাত। কলাগাছও রয়েছে কিছু। বাঁপাশের বাড়িটা পুড়ে গেছে বলে শুধু ধ্বংসাবশেষ। ডানদিকে অনেকটা খালি জমি, ওদিকটায় কোন বাড়ি নেই। কমলিকা দেবীর বাড়িতে কোন ঘরে তখনো আলো জ্বলে ওঠেনি তাই আমরা ভাবলাম উনি হয়তো বাড়িতে নেই। হঠাৎ আমাদের প্রচন্ড চমকে দিয়ে বীভৎস একটা চিৎকার ভেসে এলো বাড়ির ভিতর থেকে। ভীষণ ভয়াবহ সেই চিৎকার।তমালবলল, "বলতে ভুলে গিয়েছিলাম মনে হয় এই রকম চিৎকার নাকি প্রায়ই শোনা যায়। চল এখানে আর থেকে কাজ নেই। কী করছেন মহিলা কে জানে।"

ফিরে এলাম আমরা। রাতের খাওয়ার প্রচুর আয়োজন করেছিলেন মাসিমা তাই পেট পুরে খাওয়া দাওয়া হল। শুতে শুতে বেশ রাত হল বলেই কিনা কে জানে আমার ঘুম আসতে খুব সময় নিচ্ছিল। অবশ্য কানে ওই ভয়ঙ্কর চিৎকারটা বাজছিল। সত্যি বলছি ওই রকম চিৎকার আমি কোনদিন শুনিনি। তাই সাত্যকিদাকে একটা ফোন করলাম। ঘটনাটা জানিয়ে বললাম কমলিকা সেন সম্পর্কে কিছু খুঁজে বার করতে পারে কিনা। সাত্যকিদা যে রাতে জেগে থাকবে সেটা আমার জানা ছিল, ও যে দৈনিক খবরাখবরের সাংবাদিক। কিছু বার করতে পারলে ওই পারবে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একরাশ জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম তমালের সাথে। ওদের গ্রামের জাগ্রত মন্দির আর আরো দুয়েকটা টুকি টাকি জিনিস দেখিয়ে তমাল বলল, "সকালে পলাশদার সাথে কথা বলেছি উনি এখন থাকবেন বাড়িতে। সাহেব বাড়িটা পলাশদার সাথে গেলেই মজা পাবি। উনি দারুণ গল্প বলতে পারেন। আমার সাথে যাওয়া আর ওনার সাথে যাওয়ায় আকাশ পাতাল তফাৎ।"

পলাশদার বাড়ি পৌঁছে দেখলাম উনি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনজনে মিলে সাহেব বাড়িতে গেলাম। ১৮৫০ সালে জনৈক রবার্ট মিলার নাকি ওই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। সেটা সত্যি কিনা বলতে পারব না। তবে বাড়িটা প্রকান্ড। বিশাল বিশাল থাম দেওয়া বেশ রাজকীয় দেখতে বাড়ি। এখন অবশ্য অযত্নে একেবার ভগ্নদশা।

বাগানে পা রাখার আগে পলাশদা হঠাৎ বলে উঠলেন, "সাবধান, বাগানে প্রচুর সাপ আছে। তুমি শহুরে মানুষ তাই জানিয়ে দিলাম।"

সাপ শুনে আমি একটু থমকালাম। ওই একটা জিনিস আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। সাপ শুনলেই আমার গা হাত পা হিম হয়ে যায়, সারা শরীর রি রি করে, তাছাড়া রাতে ঘুমের মধ্যে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখি। তমাল তো সেই সব জানে তাহলে কেন আমাকে ওই জায়গায় আনল ?

আমি বললাম, "তাহলে তো সাহেব বাড়িকে দূর থেকেই নমস্কার আমি আর ভিতরে যাব না।"

সেই শুনে পলাশদা আর তমালের সে কি হাসি। রাগে কান গরম হয়ে গেল আমার।

অবশেষে তমাল হাসি থামিয়ে বলল, "না রে, এখন আর কিছু নেই। তবে বাগানে সাপ হয়েছিল প্রচুর তাই আমরা সবাই চাঁদা করে সব পরিস্কার করিয়েছি।"

আমি ওদের সাথে বাগান পেরিয়ে ঢুকলাম বটে সাহেব বাড়িতে কিন্তু ততক্ষণে আমর মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে।

পলাশদা ভালই গল্প বলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিছুটা তারিণীখুড়ো, কিছুটা নীল সাহেবের কুঠি আর বেশ কিছু ভূতের গল্প মেলানো মেশানো একটা ককটেল পরিবেশন করলেন। আমার যে খুব একটা বিশ্বাস হল তা নয় কিন্তু শুনতে ভালই লাগছিল।

তমাল দেখলাম পলাশদার গুণমুগ্ধ, আমি গল্পটাকে বিশেষ আমল দিচ্ছি না দেখে ও বলল, "দিনেরবেলা বলে তোর ওই রকম লাগছে, ওটা যদি রাতেরবেলা হত না তাহলে পলাশদার গল্প শুনে তোর ভিরমি লাগত।"

তারপর তমাল আর পলাশদা মিলে আমার পিছনে লাগতে শুরু করল। আর শুরু হল তো হল শেষ যেন আর হয় না। ওরা দুজনে মিলে আমাকে একেবারে নাকাল করে ছাড়ল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে এই শেষ, আর কোনদিন তমালদের বাড়ি আসব না। এখানে সব সাহসের মূর্তিমান অবতাররা থাকে আমার মতন ভিতুদের এখানে এসে কাজ নেই। আমার যা রাগ হচ্ছিল আমি হয়তো বাড়ি ফিরেই ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যেতাম কিন্তু দেখলাম তমালের দিদি এসেছে তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাই আর বেরলাম না। তমালের দিদি ওর চেয়ে অনেকটাই বড় তাই তার ছেলে রুকু দশ বছর আর মেয়ে মন সাত বছরের। দুপুরবেলা দারুণ খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে আমি তমালকে একেবারে পাত্তা না দিয়ে রুকু আর ওর বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলতে লাগলাম। ফুটবল যেখানে খেলা হচ্ছিল সেই জায়গাটা তমালদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে। হঠাৎ রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি এসে মাঠের পাশে থামল। সুট পরা এক বয়স্ক ভদ্রলোক

গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি সুরমা দাশগুপ্তর বাড়িটা খুঁজছি। সেটা কোন দিকে তোমরা বলতে পারবে ?" খেলোয়াড়রা সবাই মাথা নেড়ে বলল, "এখানে তো ওই নামে কেউ থাকে না।"

ভদ্রলোক বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ও তাহলে কী আমিই ভুল পথে চলে এলাম ? তোমরা ঠিক বলছো তো ?" একটা ছেলে ছুটে গিয়ে পাশের একটা বাড়ির বারান্দায় বসে থাকা এক বয়স্ক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেসও করে এলো।

"নাহ, জেঠুও বললে, সুরমা দাশগুপ্ত নামে এখানে কেউ থাকে না।"

সুট পরা ভদ্রলোক যেন বেশ ঘাবড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে গেলেন। আর তক্ষুনি আমার ফোনটা বেজে উঠল- সাত্যকিদা।

বেশ কিছুক্ষণ কথা হল সাত্যকিদার সাথে। যা বলার দরকার ছিল না এমনও অনেক কথা তাকে বলে দিলাম। বিকেলবেলা মাসিমা মেসোমশাই একটা গান বাজনার আসরের আয়োজন করেছিলেন। তমালের দিদি আর তমাল দুজনেই ভাল গান গায়। যাই হোক গানটান শুনে তমালের উপর রাগটা কিছুটা কমল। শুতে যাবো তখন প্রায় রাত দুটো এমন সময় সাত্যকিদার ফোন। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর সে ফোন ছাড়ল। অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু তখন আর শরীর চলছে না তাই ঠিক করলাম যা হবার সকালেই হবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তমালকে গিয়ে ধরলাম, "আচ্ছা একটা কথা ঠিক করে বলতো, তুই আমার দলে না পলাশদার দলে ?"

তমাল চমকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সে আবার কি রকম কথা। দল হতে যাবে কেন ?"

"না, তুই ঠিক করে বল। আমার দিকে না পলাশদার দিকে ?"

"ও তুই এখনও চটে আছিস। তা তোর দিকেই থাকব। তুই তো আমার বন্ধু। পলাশদাকে আর আমি কতটুকু চিনি। উনি যবে থেকে এখানে থাকতে এসেছেন আমি তো হস্টেলে।"

"তাহলে তুই কালকের সব কথাগুলো ফেরত নিচ্ছিস তো ?"

"কী হয়েছে তোর বল তো ? এখনও রেগে রয়েছিস তোকে খেপিয়েছি বলে ?"

"না, আর রেগে নেই তবে আমি এখন যে কথাগুলো তোকে বলব সেগুলোর উত্তর তোকে ঠিক ঠিক দিতে হবে, পলাশদার সাইড নিলে চলবে না।"

"ঠিক আছে বল।"

"সুধাকরবাবুর সাথে পলাশদার চেনাশোনা ছিল ?"

"হ্যাঁ, ছিল মনে হয়। সুধাকরবাবুকে দুয়েকবার আমি পলাশদার বাড়িতে যেতে দেখেছি আর আমি তো এখানে কমই থাকি, তার মানে ওনার পলাশদার বাড়িতে যাতায়াত ছিল।"

"আর বঙ্কু ?"

"বঙ্কুর পলাশদার সাথে জানাশোনা ছিল কি না আমি জানি না কিন্তু সুধাকরবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল বঙ্কু। ওনার কাছে তাই চাঁদা চাওয়ার জুলুমবাজি করত না।"

"হুমম !"

"কি হয়েছে বল তো ?"

"পলাশ বরণ পাল যিনি মনোবিজ্ঞানের বই লেখেন তিনি ছমাস হল গত হয়েছেন।"

"ধ্যাৎ ! কি সব হাবিজাবি বকছিস।"

"হাবিজাবি নয় সত্যি কথা ! সাত্যকিদা ওনার প্রকাশকের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছে। খবরটা খুব সম্ভব তোর পলাশদা জানে না ! সেই কারণেই এখানে যে রয়েছে সে বই লেখা পলাশ পাল হতে পারে না। সে অন্য কেউ !"

"অ্যাঁ ! বলিস কি রে ! যদি পলাশ পাল না হয় তাহলে সে মিথ্যে কথা বলল কেন ?"

"সে আমি কী করে জানব ? তবে শোন আরো আছে। কমলিকা সেন বলে কারো নামে তেমন কিছু পায়নি সাত্যকিদা। কাল বিকেলে আমরা যখন ফুটবল খেলছিলাম তখন এক ভদ্রলোক সুরমা দাশগুপ্তর খোঁজ করছিলেন। আমার কি মাথায় পোকা ঘুরেছিল আমি সাত্যকিদাকে ওই নামটাও দিয়েছিলাম। কাল রাতে ফোন করেছিল সাত্যকিদা। পাহাড়ে ছুটি কাটাতে গিয়ে খাদে গাড়ি পড়ে গিয়ে বারো বছরের ছেলে আর স্বামীকে হারান সুরমা দাশগুপ্ত। গাড়ির চালকও সেই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিল।"

"কি সাংঘাতিক!"

"আরো আছে ! ওই দুর্ঘটনায় সুরমা দেবীর দুটি পা কাটা যায়। উনি এখানে সত্যি একা থাকার জন্যে এসেছেন। ওনার চিৎকার করার কারণ আছে। উনি মোটেই ডাইনি নন !"

"কিন্তু সুধাকর বাবুর বাড়ি পুড়ে যাওয়া আর বঙ্কুর খুন ?"

"আমি সাহেব বাড়িতে তোলা পলাশদার একটা ছবিও পাঠিয়েছিলাম সাত্যকিদাকে। দীনেশ সিংহ নামে এক দাগি ব্যাঙ্ক ডাকাতের সাথে তোর ওই পলাশদার ছবির মিল আছে। একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর হতে পারছে না সাত্যকিদা ওটা পুলিশের কাজ। সুধাকরবাবু পলাশদার বাড়িতে গিয়েছিলেন কয়েকবার তুই বললি। আমার মনে হয় উনি সত্যি কথাটা কোন ভাবে জানতে পেরে তাকে ব্ল্যাকমেল

করছিলেন। আর বঙ্কুও সেটা জানত এবং সেই ব্যাপারে সুধাকরবাবুকে সাহায্য করত। হয়তো তাই ওদের দুজনকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে সুরমা দেবীর ঘাড়ে দোষটা চাপাতে সুবিধা হয়েছিল মিথ্যে পলাশের।"

পুলিশও সেটাই বলল যে দীনেশ সিংহই আসলে পলাশ সেজে তমালদের গ্রামে এসে বসেছিল। সুধাকরবাবু কি রকম ভাবে জানি সেটা ধরে ফেলেন এবং সব ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ওর কাছে টাকা চাইতে থাকেন। ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে পাওয়া অর্থ থেকে কিছুকাল টাকা দেওয়ার পর বিরক্ত হয়ে সুধাকরবাবু আর বঙ্কুকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলে দীনেশ। দোষটা সুরমা দেবীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা খুব সহজ ছিল। ডাইনি অপবাদটা একবার রটিয়ে দিয়ে মজা দেখছিল সে।

কলকাতা ফিরে আসার আগে সুরমা দেবীর বাড়িতে গিয়েছিলাম একবার। ওনার আসল নাম জানি বলতে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন। কৃত্রিম পা লাগিয়ে এখন ঘরের ভিতর দিব্যি চলাফেরা করতে পারেন তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে প্রচন্ড ব্যথা হয় আর পুরানো দিনের কথা মনে পড়লেও দিশাহারা হয়ে পড়েন। বললেন, "তখন গলা ছেড়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে, এবং করেও ফেলি।"

তারপর বললেন, "আমি কিন্তু লোকের সহানুভূতি কুড়োতে চাই না। সেই জন্যেই নিজের আসল পরিচয়টা গোপন করে রেখেছিলাম আর সেটাই কিনা আমার কাল হতে বসেছিল। ডাইনি হয়ে গিয়েছিলাম। যাক তোমাদের জন্যে তাও আসল অপরাধী ধরা পড়ল।"

তমাল বলল, "আপনার ব্যাপারটা আমরা কাউকে বলিনি এবং বলবও না। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। আপনার মতন সাহসী মহিলা আমি জীবনে দেখিনি!"

শুকনো হাসি হাসলেন সুরমা দেবী, "মাঝে মাঝে যখন আমি সাহস হারিয়ে ফেলি তখন কাল্লুকে দেখি। ওর তো তিনটে পা, ওকে তো কেউ কৃত্রিম পাও দেয়নি তাও ও কেমন লড়ে যায়!"

সুরমা দেবীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তমাল আমাকে বলল, "তুই কী করে পলাশদাকে সন্দেহ করলি?"

আমি বললাম, "দূর, সন্দেহ টন্দেহ কিছু নয়। ওর উপর আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল তাই সাত্যকিদাকে ফোনে বলেছিলাম পলাশ পাল সত্যি সাইকলজির বই লেখেন কিনা সেটা খোঁজ নিতে। সেই কেঁচো খুঁড়তে গিয়েই তো সাপ বেরিয়ে পড়ল। ও যদি ওইভাবে আমার পিছনে লেগে আমাকে অপদস্থ না করত তাহলে আমি কোনদিন ওর নামটা যাচাই করে দেখতে বলতাম না!"

লিমেরিক

মহাবীর নন্দী

একপারে জোড়াসাঁকো আর পারে বোলপুর,
রবিঠাকুরের গানে দুইপার ভরপুর।
বৈশাখে শুরু গান
বর্ষ শেষে অবসান
এপারে ওপারে মিলে দু'পারেই রবিঠাকুর।

তাপস্ পাল

তুলো তুলো মেঘগুলো ঐ ছুটছে যে পাল তুলে,
শিউলি ঝরা ভোরের শিশির বাঁধন গেছে ভুলে।
ঢাকে কাঠি পড়ল বুঝি
সেই তালে যে মা'কে খুঁজি
নদীর পাড়ে মন মেতেছে, ঢেউ ওঠে কাশফুলে।

নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী

চশমা পরে খেঁকশিয়ালটা পন্ডিত সাজলো বেশ
উপযুক্ত ছাত্র খুঁজতে ঘুরল সারা দেশ।
কুকুর বেড়াল কচ্ছপ কুমির
জুটলো আরো গরিব-আমির
অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পড়বে তারা বেশ।।

নীতীশ চৌধুরী

লোডশেডিং-এ বেজায় কাবু পুরুলিয়ার পিনাকী,
নৈশভোজে খেয়ে ফেলেন রুটির সাথে কি না কি,
টর্চে জোনাক পোকা পুরে
তাই তো এখন বেড়ান ঘুরে
আলমারিতে নিত্য পোষেন লক্ষ-কোটি জানাকি।

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবন জাগো

সেই কবেকার লোহার কামান দাঁড়িয়ে নিথর
খানিক জেগে মাটির ওপর, খানিক মাটির ভিতর।
ভুলেই গেছে গাঁয়ের মানুষ, সেদিন কবে
কামান গোলা ছুটতো মরণ মহোৎসবে।
সেদিন ছিল প্রলয় আগুন, মরণ ছোঁয়া
ঠিক যেন বাঘ শিকার দেখে ফোলায় রোঁয়া।
সময় গড়ায় চারদিকে আজ দৈন্যদশা
খিলান ভাঙা আলগা ইঁটের দেয়াল ধসা।
সেই সময়ের কেউ বেঁচে নেই আবছা স্মৃতি
লোকের মুখে হাওয়ায় ছড়ায় অলীক ভীতি।
মরচে পড়া কামানটা আজ একলা পড়ে
ঝিমিয়ে যেন সাবেক স্মৃতি আকড়ে ধরে।
চলার পথে গাঁয়ের মানুষ লোকের ভীড়ে
থুবড়ে পড়া কামান দ্যাখে হঠাৎ ফিরে।
চমকে ওঠে কান্ড একি কামান মুখে
আগুন তো নয়, ফুল ফুটেছে, সৃষ্টি সুখে।
স্বপ্ন দ্যাখায় হলদে ফুলের লাজুক হাসি
বলছে দ্যাখো, জীবন জাগে ভয় বিনাশী।

শীতল চট্টোপাধ্যায়

ওই তো

ওই তো দেখি মাটিও থাকে
আকাশের দিকে চেয়ে,
ওই তো গাছের পাতাদের দেখি
স্বর হয়ে চলে গেয়ে।
ওই তো শালুক নিয়েছে বেঁধে
ঝিলের জলেতে ঘর,
ওই তো ছায়ারা জল আয়নায়
খুঁজে চলে অন্তর।
ওই তো নদী কিশোরীর মত
উছল পায়েতে ছোটে,
ওই তো আকাশ নীল চোখ মেলে
রাত শেষে চেয়ে ওঠে।

সতীশ বিশ্বাস

মায়ের মুখ

মায়ের সাথে লুকোচুরি
খেলছিল চিত্রালি
খেলছিল আর হাসছিল আর
দিচ্ছিল হাততালি
খাটের নীচে লুকিয়ে সে
বলল, 'ওমা, টুকি!'
নীচু হয়ে মা বলল,
'ওই তো আমার খুকি।'
এরপরে মা এগিয়ে গেল
খোলা বইয়ের দিকে —
যেই বলল 'টুকি', খুকু
ঘোরায় চোখদুটিকে।
কোথায় গেল মা, এখুনি
ছিল তো এইখানে!
অবাক হয়ে ভাবল সে, -মা
এমন জাদু জানে।
ফাঁকা ঘরে চিত্রালি তার
মাকে খোঁজে একা —
দেখল ঘরের সবই, শুধু
মা'র পেল না দেখা
ডাকল তখন 'মাগো, তুমি
কোনখানে এই ঘরে ?'
মা বলল, 'এই তো আমি
টে-বি-লের উপরে।'
অমনি খুকু বইয়ের উপর
ঝুঁকিয়ে তার বুক-
দেখল, বাংলা বর্ণমালায়
ভাসছে মায়ের মুখ!

সঞ্চারী ব্যানার্জী

ভাল্লাগে না

সকাল-সন্ধ্যে পড়া পড়া আর লাগেনা ভালো,
রাত্রি হলেই মনে হয় চাই না দিনের আলো।
সকাল হলেই পড়তে হবে অনেক রকম পড়া,
ইস্কুলেতে দিদিমণি রাশভারী আর কড়া।
না পারলে বেদম চটেন দেখেই লাগে ভয়,
শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি সকাল কেন হয় ?
হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়ি মা দেন ওঠার তাড়া,
ওঠো, এবার পড়তে বসো করতে হবে পড়া।
পড়তে আমার ভাল্লাগে না খেলতে ভালোবাসি,
ছুটির দিনটা এলে পরে হাঁফ ছেড়ে যে বাঁচি।

ম্যাজিক ছাতা

তরুণকুমার সরখেল

ভুতুড়ে ছাতা মাথায় দিলেই ঘটে যায় অদ্ভুত সব ঘটনা। এ ছাতা কুড়িয়ে পেয়ে মাথায় দিয়েছে ক্লাস সেভেনের মতি, ভবঘুরে শিবু, অভিনেতা হতে চাওয়া নিতাই, মুখে মুখে ছড়া বলায় দক্ষ ধনপতি। কি হল তারপর ? জানতে হলে পড়তে হবে ম্যাজিক ছাতা।

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

জীবন জাগো

সেই কবেকার লোহার কামান দাঁড়িয়ে নিথর
খানিক জেগে মাটির ওপর, খানিক মাটির ভিতর।
ভুলেই গেছে গাঁয়ের মানুষ, সেদিন কবে
কামান গোলা ছুটতো মরণ মহোৎসবে।
সেদিন ছিল প্রলয় আগুন, মরণ ছোঁয়া
ঠিক যেন বাঘ শিকার দেখে ফোলায় রোঁয়া।
সময় গড়ায় চারদিকে আজ দৈন্যদশা
খিলান ভাঙা আলগা ইঁটের দেয়াল ধসা।
সেই সময়ের কেউ বেঁচে নেই আবছা স্মৃতি
লোকের মুখে হাওয়ায় ছড়ায় অলীক ভীতি।
মরচে পড়া কামানটা আজ একলা পড়ে
ঝিমিয়ে যেন সাবেক স্মৃতি আকড়ে ধরে।
চলার পথে গাঁয়ের মানুষ লোকের ভীড়ে
থুবড়ে পড়া কামান দ্যাখে হঠাৎ ফিরে।
চমকে ওঠে কান্ড একি কামান মুখে
আগুন তো নয়, ফুল ফুটেছে, সৃষ্টি সুখে।
স্বপ্ন দ্যাখায় হলদে ফুলের লাজুক হাসি
বলছে দ্যাখো, জীবন জাগে ভয় বিনাশী।

শীতল চট্টোপাধ্যায়

ওই তো

ওই তো দেখি মাটিও থাকে
আকাশের দিকে চেয়ে,
ওই তো গাছের পাতাদের দেখি
স্বর হয়ে চলে গেয়ে।
ওই তো শালুক নিয়েছে বেঁধে
ঝিলের জলেতে ঘর,
ওই তো ছায়ারা জল আয়নায়
খুঁজে চলে অন্তর।
ওই তো নদী কিশোরীর মত
উছল পায়েতে ছোটে,
ওই তো আকাশ নীল চোখ মেলে
রাত শেষে চেয়ে ওঠে।

সতীশ বিশ্বাস

মায়ের মুখ

মায়ের সাথে লুকোচুরি
খেলছিল চিত্রালি
খেলছিল আর হাসছিল আর
দিচ্ছিল হাততালি
খাটের নীচে লুকিয়ে সে
বলল, 'ওমা, টুকি!'
নীচু হয়ে মা বলল,
'ওই তো আমার খুকি।'
এরপরে মা এগিয়ে গেল
খোলা বইয়ের দিকে —
যেই বলল 'টুকি', খুকু
ঘোরায় চোখদুটিকে।
কোথায় গেল মা, এখুনি
ছিল তো এইখানে!
অবাক হয়ে ভাবল সে, -মা
এমন জাদু জানে।
ফাঁকা ঘরে চিত্রালি তার
মাকে খোঁজে একা —
দেখল ঘরের সবই, শুধু
মা'র পেল না দেখা
ডাকল তখন 'মাগো, তুমি
কোনখানে এই ঘরে ?'
মা বলল, 'এই তো আমি
টে-বি-লের উপরে।'
অমনি খুকু বইয়ের উপর
ঝুঁকিয়ে তার বুক-
দেখল, বাংলা বর্ণমালায়
ভাসছে মায়ের মুখ!

সঞ্চারী ব্যানার্জী

ভাল্লাগে না

সকাল-সন্ধ্যে পড়া পড়া আর লাগেনা ভালো,
রাত্রি হলেই মনে হয় চাই না দিনের আলো।
সকাল হলেই পড়তে হবে অনেক রকম পড়া,
ইস্কুলেতে দিদিমণি রাশভারী আর কড়া।
না পারলে বেদম চটেন দেখেই লাগে ভয়,
শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি সকাল কেন হয় ?
হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়ি মা দেন ওঠার তাড়া,
ওঠো, এবার পড়তে বসো করতে হবে পড়া।
পড়তে আমার ভাল্লাগে না খেলতে ভালোবাসি,
ছুটির দিনটা এলে পরে হাঁফ ছেড়ে যে বাঁচি।

ম্যাজিক ছাতা

তরুণকুমার সরখেল

ভুতুড়ে ছাতা মাথায় দিলেই ঘটে যায় অদ্ভুত সব ঘটনা। এ ছাতা কুড়িয়ে পেয়ে মাথায় দিয়েছে ক্লাস সেভেনের মতি, ভবঘুরে শিবু, অভিনেতা হতে চাওয়া নিতাই, মুখে মুখে ছড়া বলায় দক্ষ ধনপতি। কি হল তারপর ? জানতে হলে পড়তে হবে ম্যাজিক ছাতা।

কাজলডাঙার নীলু ডাকাত

মধুসূদন ঘটী

কাজলডাঙায় এখন লোকবসতি নেই বললেই চলে। একসময় জনপদ হিসেবে খুব নামডাক ছিল। লোকজন, বাজারহাট, স্কুল, দেবদেবীর মন্দির সবই ছিল। সুখে-শান্তিতে বসবাস করত সবাই। বাধ সাধল নীলু ডাকাত।

নীলু ডাকাত কাজলডাঙার লোক না। দু'তিনখানা গ্রাম পেরিয়ে ঘন জঙ্গলের ভিতর তার আস্তানা। সাঙ্গোপাঙ্গ মিলিয়ে জনা দশেক। জঙ্গলের পোড়ো একটি বাড়িকে দুর্গ বানিয়ে নিয়েছে। একজন রাঁধুনি, দু'জন পাহারাদার। বাকিরা সবাই প্রায় ডাকাতিতে অভ্যস্ত। সব দলের যেমন একজন লিডার থাকে, এই দলে নীলু হল তাদের লিডার। বলতে পার দলনেতা। ওর কথাই শেষ কথা।

পাশের চার-পাঁচটা গ্রাম তটস্থ থাকত নীলু ডাকাতের আগমন আশঙ্কায়। কোন রাতে কতজন মিলে আক্রমণ করবে কেউ বুঝে উঠতে পারত না। শুধুমাত্র ডাকাতির পর জানাজানি হত অমুকের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল।

কাজলডাঙা গ্রামকে ডাকাতির মুখ্য এলাকা ভেবেছিল নীলু ডাকাত। তার কারণও ছিল। এই গ্রাম দরিয়া ঘেঁষা হওয়ায় লোকসংখ্যা ঘিঞ্জি ছিল না। অধিকাংশ গ্রামবাসীকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হত। বাড়িতে থাকত বুড়ো মা-বাবা, বউ আর ছেলেমেয়ে। ডাকাত তাড়াবার মত পুরুষ মানুষ খুব কমই থাকত। তাছাড়া টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি বাড়িতে থাকতই। নীলু ডাকাতের অভ্যেস ছিল প্রথমে টাকা-পয়সা হাতানো। কেননা সোনাদানা পেলে সেই তো অনেক দূরের শহরে বেচতে যেতে হবে। নীলু ডাকাতকে তো সবাই চেনে। সাজপোশাকের আড়ালে কতই বা ঢেকে রাখা যায় শরীর। মুখ দেখলেই লোকেরা চিনতে পারে।

নীলু ডাকাতের ভাল নাম জগদানন্দ সেনাপতি। থাকত নদীপাড়ের এক বস্তিতে। স্কুলে পড়াশুনো তেমন হয়নি ঠিকই, তবে অঙ্কের হিসেব মেলাতে তার জুড়ি মেলা ভার। ডাকাতির বখরা তাকেই তো ভাগ করতে হয়। পাড়ায় জগদানন্দ জগা হয়ে গিয়েছিল। ছিপছিপে শীরের ক্ষমতা ছিল খুব। আর খুব জোরে দৌড়তে পারত। নিমেষে উধাও হয়ে যেত সে। সেই ছোটবেলায় বস্তির লোকেরা তার মধ্যে একটা ডাকাত ডাকাত গন্ধ পেত।

ডাকাত দলে সবাই ডাকাত। তাহলে দলনেতাকে আলাদা করবে কিভাবে ? জঙ্গলের দুর্গে অন্যান্যদের মতই বেশভূষায় থাকত দলনেতা, কিন্তু ডাকাতি করতে গেলে সারা গায়ে নীল রং মাখত। সেই থেকে সে এখন নীলু ডাকাত। তার বিশ্বাস ছিল কৃষ্ণের রং মাখলে অল্প আলোয় বা অন্ধকারে তাকে সহজে মানুষ ভাবতে পারবে না। ভাববে কোনও দেবতা।

দেবতাই বটে নীলু ডাকাত। সে যে ডাকাতি করত, তার পুরো অংশ নির্দিষ্ট নিয়মে সকলকে ভাগ করে দিত। তোমরা ভাবতে

পার, ডাকাতরা ওই টাকা নিয়ে কী করত ! ওদেরও কি ঘর-সংসার ছিল ? মা-বাবা, ছেলেমেয়ে ? না, তা ছিল না। কারোর থাকলেও ওরা তাদের সঙ্গে থাকত না। দূর গ্রামে হয়ত ওদের বাড়ি। এখন ওরা সবাই ডাকাত। গ্রামেও ফেরে না। বেশিরভাগ বস্তি থেকে ওরা উঠে আসে অনাহার, অবহেলার স্বীকার হয়ে। এখানে দু'বেলা পেট ভরে খেতে তো পায় !

ওরা সেই সব বস্তির প্রাইমারি স্কুলে লোক পাঠাত। তাদের হাতে তুলে দিত বই-খাতা, জামা-কাপড়, কখনও খাবারও। নীলু ডাকাতের ফর্মান ছিল খাও-দাও, আনন্দ কর। অতিরিক্ত টাকা দান কর। দান করলে পুণ্যি হয়।

তাহলে ওরা ডাকাতি করে কেন ? অন্যভাবেও তো জীবন কাটাতে পারত। আসলে ওরা যাদের অনেক আছে তাদের ঘরই ডাকাতি করে। আর যাদের নেই তাদের মধ্যে বিলি করে আনন্দ পায়। তাই নীলু ডাকাতকে ওরা দেবতাজ্ঞানে পুজোও করত। সপ্তাহান্তে অপেক্ষা করে থাকত, কখন নীলু ডাকাতের উপহার আসবে।

এবার কাজলডাঙায় স্থায়ী হয়েছে নীলু ডাকাতের দল। কেননা, দু'একটি ঘর ছাড়া আর কেউ নেই এ গ্রামে। লোকে বলে ডাকাত গ্রাম। ডাকাতি হলে লোকজন ভয় পাবে। পুরুষ মানুষেরা যেহেতু বাইরে বেশিরভাগ কাজে যায়, টাকা রোজগার করে। ছেলেমেয়েদের এভাবে ভয়ঙ্কর গ্রামে ফেলে রাখতে চাইবে না। তারাও দিন দিন শহরগামী হতে শুরু করল। কয়েক বছরে গোটা গ্রামটাই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। সরকারী চেষ্টায় কয়েকবার তল্লাসী হয়েছিল কাজলডাঙা গ্রামে। কিন্তু নীলু ডাকাতের টিকিটিও খুঁজে পায়নি। পাবে কি করে। ওরা যেভাবে দান-ধ্যান করত তাতে ওইসব গ্রামের লোকেরাই লুকিয়ে রাখত নীলু ডাকাতদের। পুলিশ গ্রাম ছাড়লে তারাই খবর দিত।

নীলু ডাকাত কাজলডাঙা গ্রামে একটি মন্দির বানিয়েছে এখন। জঙ্গলের দুর্গে থাকতে থাকতে নিজেদের জংলি ভেবে ফেলেছিল। খাবার-দাবার, চালচলন অনেকটা জংলিদের মত হয়ে গিয়েছিল। কাজলডাঙা যখন শুনশান হয়ে গেল তখন নিরাপদে গ্রামে এসে গোটা গ্রামটাই তাদের রাজত্বে নিয়ে নিল। ঘোরাঘুরি করতে আর তেমন অসুবিধে হয়নি। তবে ডাকাতির উপদ্রব আশপাশের গ্রামে ছিলই। ওদের বেশভুষা সাজগোজ দেখে রাতের পাহারাদাররাও ভয়ে লুকিয়ে পড়ত। শুধু জেগে থাকত কয়েকটা রাস্তার কুকুর। ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করত। মাঝে মাঝে ডাকাতদলের পিছন পিছন ঘুর ঘুর করতেও দেখা যেত। ডাকাতরা বুদ্ধি করে রাস্তার কুকুরদের জন্য ভালমন্দ খাবার নিয়ে যেত। খাবার পেলে সব কুকুরই তাদের পোষ্য হয়ে যায়।

নীলু ডাকাতের তৈরি মন্দিরে কালীমাতাই তো থাকবে। ডাকাতদের আরাধ্য দেবী শ্মশানকালী। কিন্তু আশ্চর্যের ! নতুন মন্দিরে অধিষ্ঠিত হলেন কৃষ্ণ-রাধা। ছোটবেলায় একবার স্কুলে মনের মত সাজো প্রতিযোগিতায় জগদানন্দ কৃষ্ণ সেজে পুরস্কারও পেয়েছিল। গ্রামে তো অনেকে তখন ওকে কৃষ্ণজগাই বলে ডাকত। মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখা সেই ইচ্ছেকে আজ সে সত্যি করে তুলেছে। একসময় মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হল সর্বসাধারণের জন্য। কৃষ্ণ-রাধাকে অনেক সোনার গয়নায় সাজানো হল। পাহারাদার রাখা হল। আর অনেকটা দূরে পোড়ো মতন একটি দোতলা বাড়িতে থাকল গোটা ডাকাত দল। পালা করে পাহারা দিত সবাই, অবশ্য নীলু ডাকাত ছাড়া। দলনেতা তো আর পাহারাদার হয় না !

দেখতে দেখতে মন্দির দর্শনে ভীড় জমতে থাকল। অনেকে বলাবলি করত, ডাকাতের তৈরি মন্দির দর্শনে গেলে হয়ত ডাকাতের পাল্লায় পড়তে হতে পারে। কিন্তু এ যে নীলু ডাকাত! ডাকাতদলের সবাইকে নির্দেশ দেওয়া আছে দর্শনার্থীদের উপর বাটপাড়ি চলবে না। তাদের ভক্তিভরে দেব-দেবীর চরণে অঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এ গ্রাম-ও গ্রাম করতে করতে পাঁচ গ্রামে চাউর হয়ে গেল নীলু ডাকাতের কৃষ্ণ-রাধার মন্দিরের খ্যাতি। যারা দেবদেবী দর্শনে আসত তাদের প্রসাদ খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। কেউ ফিরবে না। অনেকে মন্দিরে প্রণামি দিয়ে যেত। তার অঙ্ক আবার ডাকাতির অঙ্ককেও ছাড়িয়ে গেল একসময়। সারাদিন ভক্তসমাগমে থৈ থৈ করে উঠল কৃষ্ণ-রাধার মন্দির।

নীলু ডাকাত এবার কি করবে ! নিজেদের প্রয়োজনে আর ডাকাতি করবার দরকার হচ্ছে না। প্রণামির টাকায় ভরে উঠল কোষাগার। তাছাড়া অনেক ব্যবসায়ী মানুষ তাদের নতুন ব্যবসা ফাঁদবার সময় এই মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে যায়। তাতে প্রণামির অঙ্ক অনেক বেড়ে যায়। দিন দিন নীলু ডাকাত যেন ডাকাতিই ভুলে গেল। তাদের লোক-লস্কর আর ডাকাতির প্রতি আগ্রহ দেখাল না। নীলু ডাকাতেরও তো বয়স বাড়ছে। গায়ের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। চোখের দৃষ্টিও কমে এসেছে। মন্দিরে গিয়ে ঘন্টাখানিক জপতপ করতে করতে একসময় ওই মন্দিরের সাধক হয়ে উঠল নীলু ডাকাত। পুজো-আচ্চা নিয়ে সময় বাড়তে শুরু করল। এবার ফর্মান দিল, আর সে ডাকাতি করবে না। কৃষ্ণ-রাধার পায়ে নিজেদের নিবেদন করে ফেলল। তারপর থেকে সেই নীলু ডাকাত হয়ে উঠল সাধক জগদানন্দ। এবার বাল্য জীবনের নামের আড়ালে হারিয়ে গেল নীলু ডাকাত।

হারু চোরের পকেটফোন

সমাজ বসু

যাক্, এতদিন পর একটা ইচ্ছেপূরণ হল। কথাটা শেষ করেই জামার বুক পকেট থেকে একটা ফোন বার করে বউয়ের সামনে রাখল হারু চোর।

—এটা কি গো, পকেট ফোন বুঝি ?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো। এটা না হলে আর চলছিল না। লজ্জায় মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছিল। কাতু, বিশু, নগেনরা সেই কবে থেকে ব্যবহার করছে। এর জন্য ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় শিকেয় উঠেছে। কিছুতেই সুযোগ হচ্ছিল না, আজ মওকা বুঝে মালটা হাতিয়ে নিয়েছি।

—দাওনা একটু কথা বলি। হারু চোরের বউ উৎসাহ চেপে রাখতে পারে না।

—কার সাথে কথা বলবে ? কারো নম্বর তো আমার জানা নেই। একটু চিন্তা করে হারু চোর। কয়েকটা নম্বরে আঙুল চালিয়ে সে কানের কাছে ফোনটা তুলে ধরে। কিছুক্ষণ পর একটা জাঁকালো আওয়াজ হারু চোরের কর্ণগহ্বরে ধাক্কা মারে।

—হ্যাঁলো কে বলছেন ?

—আমি হারাধন বলছি। চোখে মুখে একটা তৃপ্তির ছাপ ছড়িয়ে পড়ে তার।

—বলো, বলো শালাবাবু কি খবর। এতদিন কোথায় ছিলে ?

—আপনি কে বলছেন ? একটু ঘাবড়ে যায় হারুচোর।

—জামাইবাবুর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা না করে বলো কেমন আছো ? আমি এখনই তোমার দিদিকে খবর দিচ্ছি। তুমি ঘন্টা খানেকের ভেতর বাড়িতে চলে এসো।

—কিন্তু...

—আসবে কি করে ? মাস ছয়েক হল আমরা বাড়ি বদলেছি। পূর্ণ সিনেমার উলটোদিকে চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্টিট। পনেরো নম্বর। আসা চাই কিন্তু। আমরা অপেক্ষায় থাকবো।

ফোনের কথা শেষ হতেই হারু চোর অবাক হয়ে ভাবতে থাকে। কিছুতেই ঘোর কাটে না। কিভাবে যে জামাইবাবুর কাছে ফোনটা চলে গেল। যাক্ গে, ভালই হয়েছে। দিদির সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। এই সুযোগে নতুন বাড়িটাও দেখে আসা হবে।

—তা হ্যাঁ গো, কার সাথে অত কথা বললে ? হারু চোরের বউ জিজ্ঞেস করে।

—জামাইবাবুর সাথে কথা বললাম। দেখা করতে বলেছে। যাই দেখি, যদি তাকে বলে কিছু একটা কাজ জোটাতে পারি। এই কাজ আর ভাল লাগছে না। কথা শেষ করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে হারু চোর।

চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্টিটে পনেরো নম্বর বাড়ির দরজায় কলিং বেলে আঙুল রাখতেই দরজা খুলে যায়। হারু চোরের সামনে একটা বিরাট পাহাড় দাঁড়িয়ে। চার চারটে হারু চোরের ওজনের সমান একটা মানুষ। পকেট ফোনে আলাপরত হারু চোরের জামাইবাবু।

—আরে এসো, এসো হারাধন ভেতরে এসো। তোমার দিদি একটু বেরিয়েছে। এখনই এসে পড়বে। ইতিমধ্যে হারুচোরের কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। ঘরের চার দেওয়ালে চোখ বুলিয়ে হারুচোর তার জামাইবাবুর আসল পরিচয় পেয়ে যায়।

হঠাৎ লোকটার পকেটে ফোন বেজে ওঠে। ফোনটা বের করে কথা বলা শুরু করে লোকটা।

—হ্যাঁ ম্যাডাম, ধরা পড়েছে। আমি অক্ষুনি আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কথা শেষ করে লোকটা এবার হারুচোরের দিকে তাকায়।

—দাঁড়াও, একটু বেরোবো, এই বলে লোকটা ঘরে ঢোকে। এই ফাঁকে হারু চোর পকেটের ফোনটা টেবিলে রেখে দরজা খুলে চোঁ চাঁ দৌড়। বাঘের থাবার মত এই বুঝি ঘাড়ে এসে পড়ে থানার বড়বাবুর শক্ত হাত। ছুঁলেই আঠারো ঘা।

অদ্ভুত এক অ-ভূত শহর

প্রণব হোড়

কলকাতার শহরে আগে অনেক ভূত ছিল। কালীপুজোর সময়, ভূত চতুর্দশীর দিন চারিদিক গিজ্ গিজ্ করত ভূত। সবাই যে চতুর ভূত ছিল তা আমি বলব না, ফতুর ভূতও ছিল, কন্দকাটা, বেহ্মদত্যি, গোভূত মোটামুটি সবরকম ভূতেরই বেশ আনাগোনা ছিল সেই সময়। শুধু মামদো ভূতেরা ঐ সময় আসতো না। তারা আসতো অন্য সময়। এটুকু বলতে পারি সেই সময় এই শহরে তেমন ভূতের অভাব ছিল না।

কলকাতার আনাচে কানাচে এই সেদিনও কত ভাঙা বাড়ি দেখা যেত। সেখানেই তারা ডেরা বেঁধে থাকতো। তাছাড়া শহরে অনেক গাছও ছিল, কবরস্থান-শ্মশানগুলোতে এত হ্যালোজেন লাইটও ছিলনা। রাতদুপুরে নিশ্চিন্তে বেশ হুল্লোড় করতে পারতো তারা। আমার ছোটবেলায় বেশ মনে আছে কালীপুজোর সময় শ্যামাপোকার অত্যাচারে লাইট জ্বালিয়ে সন্ধ্যেবেলায় পড়াশোনা করতে পারতাম না। রাস্তার নিয়ন আলোগুলো ঢেকে যেত সেই সব পোকাতে।

সেইসব পোকাও এখন বিশেষ একটা দেখা যায় না, ভূতও নয়। ভাবছ ভূতের ব্যাপার স্যাপার জানলাম কেমন করে ? ভূতের ওঝারাই তো নেই। তখন কত ওঝা ছিল। না খেতে পাওয়া লোকগুলোকে ভূত ধরতো আর ওঝা এসে মন্ত্র পড়ে, সর্ষে ছিটিয়ে তাড়াত। ভাবছ কুসংস্কার। ভূত বলে কিছু হয় নাকি ? হয়তো তাই। সেই জন্য শহরবাসীরা সবাই শিক্ষিত হল। মস্ত মানুষ হল। পয়সা আয় করল। তারপর সবাই গাড়ি কিনল। কেউ আর ভূতে বিশ্বাস করল না। কিংবা ভূতেরাও আর এই শহরটাকে বিশ্বাস করল না। ভাবছো কেন ? তাই তো, বেশ তবে বলি ব্যাপারটা।

কলকাতা থেকে বেশ কয়েকমাইল দূরে একবার এক আধা শহরতলি অঞ্চলে রথের মেলা বসেছিল। গাছপালা ভর্তি বেশ সুন্দর জায়গা সেটা। কত মানুষের ভিড়। কেউ পাঁপড় খাচ্ছে, কেউ ভেঁপু বাজাচ্ছে, কেউ খেলনাপাতি দরদাম করছে। আর কেউ কেউ গ্যাস বেলুন ওড়াচ্ছে। এক গ্যাস বেলুনওলা বড় এক সিলিন্ডারে হাইড্রোজেন ভরে এস্তো বড় সব বেলুনে সেগুলো ভরে ভরে বিক্রি করছিল। আর ছোট ছোট বাচ্চারা হুটোপুটি করে কিনছিল সেগুলো।

বিপদটা ঘটলো সেখানেই।

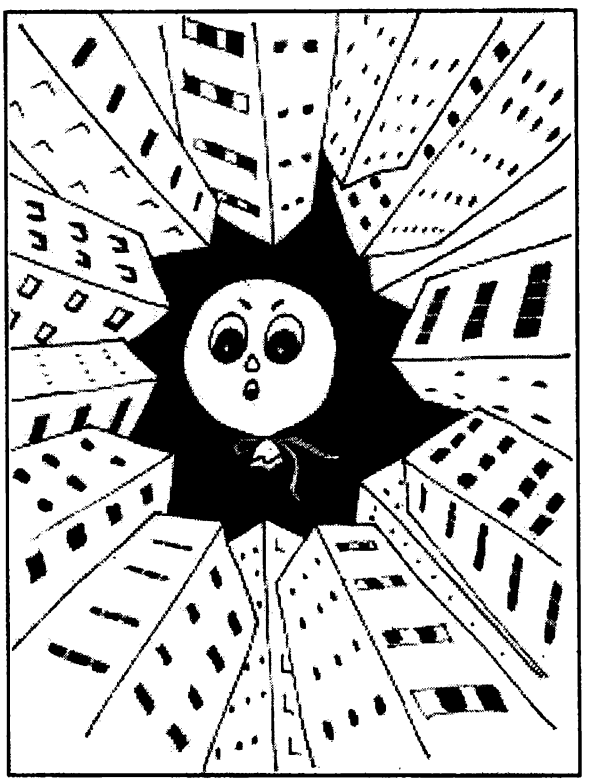

এক মা ভূত তার ছানা ভূতকে নিয়ে মেলায় ঘুরছিল। ওদের তো আর দেখা যায় না। হাওয়ায় বেশ ভাসতে ভাসতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা। ছানা ভূতটা গ্যাস বেলুন দেখে বেশ খুশিতে ডগমগ। মাকে বলল, ঐ বেলুনে চেপে উড়বে। মা বলল একদম না। ভূতেদের মধ্যেও জাতপাত থাকে তো, বেলুন চড়ে উড়লে ওকে যদি কেউ উড়ে ভূত বলে তখন লজ্জার শেষ থাকবে না, তাই মা ভূত ছানা ভূতের হাত টেনে অন্য জায়গায় যেতে গেল। কিন্তু পারল কই ? তার আগেই ঘটে গেল বিপত্তি।

কীভাবে যেন বেলুনে গ্যাস ভরবার সময় ছানা ভূত সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল বেলুনের মধ্যে। হঠাৎ মা ভূত দেখে ছানা ভূত তার হাত থেকে গায়েব। আর বেলুনটার মধ্যে কি যেন একটা নড়ছে আর মা মা বলে কাঁদছে।

শিউরে উঠল মা ভূত। কি হবে এখন ? বেলুনটা না ফাটালে ছানা ভূত তো বেরোতে পারবে না। কি করা যায় ? চোখে জল চলে এল মা ভূতের। কাছাকাছি আরো দু-একজন ভূত ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের কাছে সাহায্য চাইল সে। সবাই ভীড় করল কিন্তু গ্যাস বেলুনটা ফাটাতে পরলো কই ?

হঠাৎ কোত্থেকে বাবার সাথে বাইকে চেপে এসে একটা ছোট্ট ছেলে ঐ বেলুনটা কিনল। তারপর বাইকে চেপে আবার কোথায় যেতে লাগল। হাতে সুতোয় বাঁধা বেলুনটা উড়ছে তখন। পেছন পেছন মা ভূত আর অন্যান্য ভূতেরাও ছুটতে লাগল। হঠাৎ কী কুক্ষণে ছেলেটার হাত থেকে বেলুনের সুতো ছিঁড়ে গেল। ফর্ ফর্ করে বেলুনটা উড়ে গেল আকাশে।

ভূতেরাও বেলুনটার সাথে সাথে উড়তে লাগল আকাশে। কিন্তু কোনদিকে উড়তে লাগল জানো ? কলকাতার দিকে। ভূতেদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। ভূতেদের রাজা খবর পাঠিয়েছে কলকাতার আকাশ কালোতে কালো। শহরের সব কালো ধোঁয়া আকাশে এসে জমেছে। গাড়ির ধোঁয়া, বিশেষ করে মোটরবাইক, বাস, লরি এমনকি গঙ্গার ধারে কারখানাগুলোর কালো ধোঁয়াও সব মিশে গিয়েছে সেখানে। কোথাও গাছ নেই, পুকুর নেই, তবে কুকুর আছে রাস্তায়। কিন্তু তাতে কি ? তারাও ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে কেমন রোগাটে হয়ে গেছে। এখন চোর ছ্যাঁচড়দেরও ধরতে পারে না। অবশ্য এখন আর এই শহরে চোরও নেই। যখন ভূত ছিল, ওঝারা ছিল তখন চোরেরাও ছিল। এখন চোরেরাও সব শিক্ষিত। কম্পিউটারে ইন্টারনেটে ঢুকে কী সব চুরি টুরি করে বেড়ায়। তাদের পোষা ভাইরাস আছে। কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেয় সেগুলো। নেড়ি কুকুরগুলো সেই ভাইরাস ধরতে পারেনা। তা সে যাই হোক, সেই ঘন কালো ধোঁয়ার মধ্যে গ্যাস বেলুন যদি ঢুকে যায় তাহলে সাংঘাতিক বিপদ। আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভূতের রাজার সভাসদ রাজ-বৈজ্ঞানিক এ ব্যাপারে খুব ভালো ওয়াকিবহাল। তার বউও নাকি ঐ ধোঁয়ার মধ্যে একবার হারিয়ে গিয়েছিল আর পাওয়া যায় নি। ছানা ভূতের মাকে সাহায্য করতে সেই বৈজ্ঞানিক ভূত ছুটে এল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে। দূর থেকে যাতে বেলুনটা টেনে আনা যায়। কিন্তু তাতেও হল মুস্কিল। বেলুন আসার আগে কালো ধোঁয়াগুলোই বরং এগিয়ে এল। ঢেকে ফেলল বেলুনকে। কঁকিয়ে উঠল মা ভূত। সাহায্য করতে এসে যে বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা বুঝতে পেরে রাজ-বৈজ্ঞানিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে বেমালুম ধাঁ। বাকি ভূতেরা মা ভূতকে বলল, পালাও পালাও। নয়তো ঐ ধোঁয়া আমাদের গিলে ফেলবে। নাকি সুরেই বলল কথাগুলো। ভূতেরাও নাকিসুরেই যেমন কথা বলে থাকে সেরকম ভাবেই।

মা ভূতকে ধরে নিয়ে ভূতেরা সব পালিয়ে গেল। ঘন কালো ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে বেলুনটা কলকাতার একদম মধ্যে চলে এল। হঠাৎ নামল বৃষ্টি। উঠল ঝড়। চমকালো বিদ্যুৎ। যে বেলুন ফাটছিল না সেটা এখন ফটাস করে ফাটল। ছানা ভূত হাউ হাউ করে বেরিয়ে এসে তার মাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় পাবে মাকে ? বৃষ্টির সাথে সাথে সেও নেমে এল শহরের রাস্তায়। অনেক মানুষের ভীড় সেখানে। ছানা ভূত নিজের মাকে না পেয়ে স্বজাত খুঁজতে লাগল। একটাও ভূত পেল না কোথাও। সারারাত ধরে শহরে এত আলো জ্বলছে যে চোখ জ্বালা করছে। রাস্তায় ফুটপাথে কত মানুষকে এদিক সেদিক শুয়ে থাকতে দেখল কিন্তু নো ভূত। এটাই অদ্ভুত। বাতাসটাও কেমন ভারি ভারি ঠেকছে। ছানা ভূত ভাসতে গিয়ে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠছিল।

হাঁটতে হাঁটতে কিংবা ভাসতে ভাসতে ছানা ভূত একটা গাছ খুঁজছিল। নিমগাছ, পাকুড়গাছ, বটগাছ যে কোন একটা গাছ অথবা ভাঙা বাড়ি। কিন্তু পাবে কোথায় ? সে তো কবেই উচ্ছেদ হয়ে গেছে। ব্যাপারটা আরো খোলসা হল এক প্রমোটার ভূতের দেখা পেল সে, সদ্য সদ্য ভূত হয়েছে সেটা। এই শহরে শয়ে শয়ে গাছ কেটে সে বিল্ডিং তুলেছে। প্রচুর মুনাফা লুটেছে। কিন্তু মরলে সেই মুনাফা আর কি কাজে লাগবে ? এখন চাই গাছ। গাছে চড়ে বেশ ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকা যাবে। গাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রমোটার ভূত। ছানা ভূতকে বলল তুমিও গাছ খোঁজো। পেলে আমায় বলো।

তার ভাবগতি খুব ভালো ঠেকল না ছানাভূতের। ঠিক করল যেমন করে সে এখানে এসেছে তেমন করেই সে পালাবে এখান থেকে। যেখানে দেখবে সিলিন্ডারে গ্যাস বেলুন ফোলানো হচ্ছে সেখানে গিয়ে আবার সে সুড়ুৎ করে ঢুকে যাবে বেলুনের মধ্যে তারপর আবার উড়তে উড়তে দেবে পাড়ি। মা'র কাছে যাবে সে।

কিন্তু কোথায় গ্যাস বেলুনওলা ? ওরা তো থাকে বাচ্চাদের পার্কের আশে পাশে। কিন্তু এই শহরে পার্ক কোথায় ? সব এখন কার পার্কিং -এর জায়গা। বাচ্চাদের খেলার মাঠ আর কোথাও নেই। বেলুওলাও তাই আর বেলুন বেচে না। কিনবে কে বেলুন ?

দুঃখে ছানা ভূত মা মা করে আবার কাঁদতে লাগল।

তারপর কী হয়েছিল আর আমার জানা নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ব্যাপারটার খোঁজ খবর নাও তো নিতে পারো।

ভূতের মৃত্যু

জন পুততুণ্ড

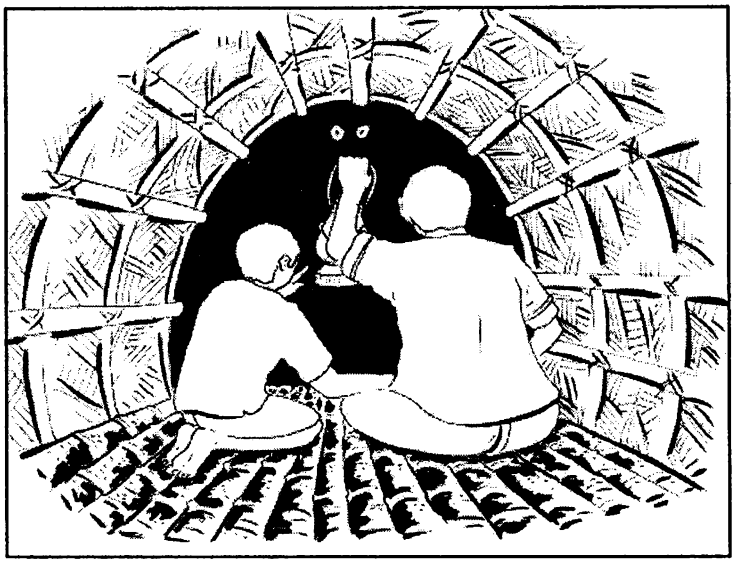

গ্রীষ্মের ছুটিতে জয়ন্ত মামাবাড়ি ঘুরতে গেল। টানা এক মাসের ছুটি। সেজমামা এসেছিলেন তাকে নিতে। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় মা বারবার বলে দিয়েছিল সকাল-সন্ধে একটু পড়াশোনা করিস। তাই সঙ্গে বইয়ের ব্যাগটাও নিতে হয়েছিল তাকে। এছাড়া বলেছিল বড়দের কথা শুনে চলবে, অমান্য করবে না।

সেজমামার সঙ্গে যখন সে মামাবাড়ি গাজোলে পৌঁছল, তখন পড়ন্ত বিকেল। দাদু-দিদা, মামা-মামি, ভাই-বোনেরা তাকে পেয়ে খুব খুশি।

পরদিন থেকে জয়ন্তর দস্যিপনা শুরু হয়ে গেল। ছোটমামা তার সমবয়সি, তাই তাদের বন্ধুত্বও বেশি। এদিক-ওদিক গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় তারা। কালিদিঘিতে স্নান করতে নামলে কিছুতেই উঠতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সেজমামা ঘাটে এসে যখন বলে যে দিদিকে সব বলে দেব, তখন তারা উঠে আসে।

বৃহস্পতিবারের হাটে ছোটমামার সঙ্গে জয়ন্ত পৌঁছল। সেখানে প্রচুর ভিড়, সারা সপ্তাহের জিনিসপত্র কিনতে আসেন এ-গ্রাম, সে গ্রাম থেকে। কোথাও সবজি, কোথাও মাছ-মাংস, আবার কোথাও পাইকারি শস্যের হাট, কোথাও গবাদি পশুর হাট। লোকে লোকারণ্য।

এক বাঁশিওয়ালা দেখে জয়ন্ত ছোটমামাকে বলল, "মামা আমি একটা বাঁশি কিনব।"

ছোটমামা বলল, "কিন্তু তুই তো বাঁশি বাজাতে জানিস না।"

"তুমি তো ভালো বাজাতে পারো, গতবার তো তোমার বাঁশি বাজানো শুনেছি।"

ওরা দু'জনে একটা বাঁশি কিনে, গরম গরম গুড়কাঠি আর ছোলা ভাজা খেতে খেতে বাড়ি ফিরে এল।

বিকেল থেকে শুরু হল ছোটমামার কাছে জয়ন্তর বাঁশির তালিম।

জয়ন্ত ক'দিনেই বেশ ভালো বাঁশি বাজাতে শিখে গেল। এখন ওর সঙ্গী হয়ে উঠল ওই বাঁশি।

একদিন সেজমামা জয়ন্তকে বলল, "শোন, কাল ভোরবেলায় তোকে নিয়ে যাব আমাদের বাঘমোরার ধানখেতে।"

জয়ন্ত খুব খুশি। আনন্দে তার সারা রাত ঘুম হল না। পরদিন ভোরবেলায় গরুরগাড়িতে সেজমামার সঙ্গে সে রওনা হল বাঘমোরার উদ্দেশ্যে। মাটির রাস্তা, গরুরগাড়ি চলেছে কেঁচরমেঁচর শব্দ তুলে আপনমনে, পথে যেতে যেতে মামার সঙ্গে এটাসেটা কথা হচ্ছে। তারপর মামা জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করল, "ভূতের গল্প শুনবি ?"

জয়ন্ত সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

মামা একের পর এক গল্প বলে চললেন, কিন্তু জয়ন্ত কিছুতেই বিশ্বাস করল না ভূত বলে এই পৃথিবীতে কিছু আছে বলে। দিনেরবেলা তাই ভয়ও পেল না সে।

প্রায় আড়াই তিন ঘন্টা পর তারা তাদের জমিতে পৌঁছল। জমির পাশেই বিশাল বাঁশঝাড়। ঠিক তার পাশেই একটা মাচা করা ছিল। ওপরে খড়ের ছাউনি। সেখানে বসে বাড়ি থেকে আনা মুড়ি আর গুড় দিয়ে সকালের জলখাবার সেরে ফেলল। ওদিকে জমির দিকে নজর যেতেই দেখল খেতমজুররা কাজ করছে। চারধার সোনালি বর্ণে প্লাবিত। আসলে ধান পাকা শুরু হয়ে গেছে দিন দশেক আগে থেকেই। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে মামার সঙ্গে যখন বাড়ি ফিরে এল তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

এরপর এক সপ্তাহ বাদে সেজমামা জয়ন্তকে বলল, "তুই ভূত আছে বলে বিশ্বাস করিস না, কিন্তু আজ তোকে সত্যিই ভূত দেখাব। আজ থেকে জমিতে ধান কাটা শুরু হবে। তাই আমাকে আজ থেকে ওখানেই রাত কাটাতে হবে। নাহলে ধান চুরি হয়ে যাবে।"

যথারীতি গরুরগাড়িতে করে ওরা বাঘমোরার উদ্দেশে রওনা হল। তখন দুপুর শেষে বিকেল নেমেছে।

যখন জমির কাছাকাছি পৌঁছল তখন চারধার অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সেজমামা হঠাৎ গরুরগাড়ি থামিয়ে দিল। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে মামা ?"

উত্তরে মামা ইশারায় ওকে চুপ করতে বলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "সামনে রাস্তার দিকে দ্যাখ।"

জয়ন্ত সামনের দিকে তাকিয়েই হ্যারিকেনের অল্প আলোয় দেখতে পেল কিছু একটা রাস্তার ঠিক মাঝখানে বসে আছে। মনে হল সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ । একটু একটু তার শরীর দুলছে। মামাকে সে এবার জিজ্ঞাসা করল, "কি গো ওটা ?"

মামা বলল , "ওটা ভোলেবাবা ভূত।"

জয়ন্ত আবার জানতে চাইল, "কিন্তু ওই যে দুটো নীল রঙা বড় বড় আলোর মতো জ্বলছে, ওটা কি ?"

"ওটা ভোলেবাবার দু'টি চোখ।"

"কিন্তু মামা তাহলে এখন কী করব।"

"চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হবে। ভূত যেন টের না পায় যে আমরা এই অবদি এসেছি।"

কিন্তু জয়ন্ত এবার মামাকে বলল, "কেন আমরা চুপ করে থাকব, তার চেয়ে বরং চলো ওর ওপর দিয়ে আমরা গরুরগাড়ি চালিয়ে দিই।"

"না রে, এই ভূত রেগে গেলে কিন্তু ভয়ানক। শুনেছি এর প্রচন্ড শক্তি, যখন তখন গরুর গাড়ি উলটিয়ে দেয়। তবে, কখনও শুনিনি যে কারও ক্ষতি করেছে। কিন্তু একটা উপায় আছে, দূর থেকে যদি ও ভূতকে ভোলেবাবা দয়া করো বলি তাহলে ও নাকি সরে যায় রাস্তার পাশের ওই বাঁশঝাড়ের দিকে।"

"তো এতক্ষণ অপেক্ষা করছ কেন ? আবেদন জানালেই যদি সরে যায়, তাহলে এক্ষুনি বলে ফেলি, কি বলো ?"

যেই, তারা দু'জনে নীচুস্বরে তাদের আবেদন জানাল, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে ভোলেবাবা ধীরে ধীরে পাশের ওই বাঁশঝাড়ের দিকে রওনা হল।

ভোলেবাবা সরে যেতেই তারা জমিতে প্রবেশ করল। বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে, মাচার ওপর বিছানা পেতে গা এলিয়ে দিল দু'জনে। জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, "মামা ওটা কি সত্যিই ভূত ?"

"না হলে কি তোকে বলতাম ? তাহলে সত্যিকারের ভূত দেখলি তো !"

জয়ন্তর এবার কিন্তু একটু ভয় হল। সে মামাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। কখন ঘুমিয়ে পড়ল খেয়াল নেই দু'জনের।

হঠাৎ মাঝরাত্রে বিকট শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। তাদের বলদজোড়া বিকট শব্দে ডাকছে। তারপর বাঁশঝাড়ের দিকে তাকাতেই জয়ন্তর চোখ ছানাবড়া। বাঁশঝাড়ে যেন ঝড় এসেছে। আর সঙ্গে ভঁস-ভঁস করা দীর্ঘশ্বাস। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে এই অবস্থা চলল। তারপর আবার চারধার চুপচাপ।

জয়ন্ত বলল, "মামা ভোলেবাবা কী রেগে গেছিল !"

"জয়ন্ত ভয় পেয়েছিস, চিন্তা করিস না। ভোলেবাবার মনে হয় কোনও কারণে মেজাজ গরম হয়েছিল। আর চিন্তা নেই, শুয়ে পড়।"

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। উঠে দেখল মামা তো তার পাশে নেই। সে মাচা থেকে নীচে নেমে এল। তারপর দেখল বাঁশঝাড়ের দিকে বেশ কয়েকজনের জটলা। জয়ন্ত এগিয়ে গেল তাদের দিকে, দেখল মামাও সেখানে উপস্থিত। আর একটু এগোতেই ওর চোখে পড়ল একটা সাদা ষাঁড় বাঁশঝাড়ে শুয়ে আছে।

"মামা কি হয়েছে ওর ?"

"এ-ই হচ্ছে ভোলেবাবা ! গত রাতে সাপের কামড়ে মারা গেছে।"

সঞ্চিতার সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদের
শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সবাই বলে পড়ো

সুচিত্রা চক্রবর্তী

পিকলু পিকলু করে সকাল থেকে মা অস্থির। পিকলু একটু চোখের আড়াল হলেই মা অস্থির হয়ে ওঠেন। পিকলুর বাবা হেডমাস্টার, তাই তিনি সারাদিন স্কুলের কাজেই ব্যস্ত থাকেন। পিকলুর দাদাই ও ঠাম্মা পিকলুর মা কে বলেন, দ্যাখো এখনকার মা-বাবাদের একটি অথবা দুটি সন্তান নিয়েই কেমন হিমসিম খাচ্ছে।

পিকলু সারাদিন এঘর ওঘর ছোটাছুটি করে। কখনও দাদাই-এর খাটে, কখনও ঠাম্মার খাটে নাচানাচি করছে। কখনও বা বল খেলছে।

পিকলু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মায়ের সাথে ছাড়া ও কারো সাথে স্কুলে যায়না। প্রথম প্রথম স্কুলে গিয়ে খুব কান্নাকাটি করত। নতুন নতুন আন্টি দেখে ভয়ও পেত। তবে এখন আর পিকলু কাঁদে না। স্কুলে যাবার সময় মা মাঝে মাঝে পিকলুর বায়ানাক্কা শুনে রেগে যান। দাদাই তখন এগিয়ে এসে পিকলুকে বলেন, চল আমি তোকে স্কুলে নিয়ে যাবো। পিকলু রাজি হয়না, বলে দাদাই -এর মাথায় সাদা চুল। সাদা চুল দেখে আমার বন্ধুরা হাসবে। মজা করবে।

ঠাম্মা পিকলুর কথা শুনে হো হো করে হাসেন। পিকলুর মা রেগে যান। বলেন, সংসারের এতো কাজ সামলে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা...

পিকলু স্কুলে গিয়ে বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকেনা। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে কখনও কখনও অন্য ক্লাসে ঢুকে পড়ে। কখনও বা মাঠে চলে যায়। বন্ধুরা পিকলুকে আপেল লজেন্স কেউবা কমলালেবু বলে ডাকে। পিকলু কিন্তু কখনও রাগ করে না। মিষ্টি হাসি হেসে সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

পিকলু সেদিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে অন্য ক্লাসে ঢুকে পড়ল। পিকলুদের আন্টি পিকলুকে ক্লাসে দেখতে না পেয়ে ছুটে গেলেন পিকলুর খোঁজে। স্বপ্না আন্টি পিকলুর কান ধরে ক্লাসে নিয়ে এলেন এবং বেশ বকাঝকা করলেন। পিকলু বকা খেয়ে ক্লাসরুম কাঁপিয়ে কান্না শুরু করে দিল। সেই কান্না শুনে স্কুলের বাকি আন্টিরাও পিকলুর ক্লাসে চলে এলেন।

বাড়ি এসে পিকলু মা-বাবাকে বলল, সে আর স্কুলে যাবে না। পিকলুর মা বললেন, স্কুলে নিশ্চয়ই পিকলুকে বকা-ঝকা করেছে। দিদিমণিদের সাথে দেখা করতে হবে। এই টুকু ছেলেকে ওভাবে কেউ বকে।

পিকলুর দাদাই এবার এগিয়ে এসে বললেন, দ্যাখো, বউমা তোমরা ভুল করছো। নিশ্চয়ই স্কুলে পিকলু কিছু একটা করেছিল। এরপর পিকলুর মুখ থেকেই ওরা জানতে পারল যে পিকলু নিজের ক্লাস ছেড়ে অন্য ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েছিল। আজকাল সামান্য ব্যাপারে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে। এই ছোট্ট কারণে স্কুলে চড়াও হওয়া ঠিক নয়। আমার মতে, তুমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্কুলে পাঠাও বউমা, পিকলুর দাদাই বললেন।

এতক্ষণ বিকলু সবার কথা শুনছিল। এবার সবার মাঝে দাঁড়িয়ে বলল, আন্টি আস্তে করেই আমার কানটা ধরেছিল। খুব আস্তে আদর করে চড় মেরেছিল। আসলে আমি তখন ইচ্ছে করেই চিৎকার করে কেঁদেছিলাম। আন্টিকে বলেছি আমার বাবা বড় পুলিস অফিসার, বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলে দেব। বাবা তোমাকে বেঁধে থানায় নিয়ে যাবে।

ছিঃ ছিঃ মিথ্যে কথা বলেছিস ? পিকলুর ঠাম্মা বললেন।

পিকলু বলল, কেন বলবো না ? স্কুলে বাড়িতে সবাই বলে পড়ো পড়ো। আসলে কি জানো আমার সবসময় পড়তে ভালো লাগেনা।

পিকলুর কথা শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। দাদাই বললেন, বেশ তো সবসময় পড়তে হবে না। শুধু পড়ার সময় পড়লেই হবে, হল তো ?

মা পিকলুকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন।

দেবতার গ্রাস

অমিতাভশঙ্কর রায়চৌধুরী

"এ্যাই এ্যাই রিক্‌শা।" হাটুঁর ব্যথায় কাতর সত্তর বছরের বুড়ি পুতুল পিসি হাঁফাতে হাঁফাতে হাঁক পাড়ল, "সঙ্কট মোচন চলেগা, বাছা ?"

রিক্‌শাওয়ালা চুপ। যেন চোখে চোখেই ওদের তিনজনকে জরিপ করে নিচ্ছে। পুতুল পিসির সঙ্গে তার দুই ক্ষুদে ভাইপো শানু আর সোনুও তো আছে। অতএব সে হাঁকল, "পচাশ রুপেয়া, মাতাজী।"

"কেয়া ? এ ব্যাটা বলে কি রে ?" পুতুল পিসির কণ্ঠে জাগে আর্তনাদ। "তিনজনের তো তিরিশ টাকা হয়।"

রিক্‌শাওয়ালাও যেন সংসদের বিরোধী পক্ষ, "তিনজন নয়, আম্মাজী, চারজন।" চোখে চোখেই পরিষ্কার ইশারা। অর্থাৎ পুতুল মাসি তো একাই দুইজন।

"আ মরণ !" কোনরকমে হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে পুতুল পিসি এগিয়ে চলে, "উরে বাবারে, আর পারিনা।" সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের সাথে বগির মত ওরা দুইভাই।

কিন্তু দ্বিতীয় রিক্‌শাওয়ালা তো আরো সেয়ানা, "ষাঠ রুপৈয়া।"

"শানু, সোনু এদের বদমায়েশি দেখছিস ?"

কিন্তু ও বেচারারা তো শুধুই দর্শকের ভূমিকায়। এ সমস্যার সমাধানই বা কি ? আবার প্রথম রিক্‌শাওয়ালাকেই ধরতে হলো। তিনজনে চেপে বসতেই রিক্‌শা চলতে আরম্ভ করল। ঘট... ঘটাং....

ব্যাস, ক'দিন থেকে এই চলছে। পুতুল পিসি আসলে বাবার দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দিদি। কাশীতে এলে এদের বাড়িতেই ওঠেন। বয়সে তো প্রায় শানু সোনুর ঠাকুমার বয়সী। তাই যা বলেন, শুনতেই হয়। যখন যেখানে যেতে বলেন শিবের নন্দী ভৃঙ্গির মত সঙ্গে যেতেও হয়। এ জন্যই তো পরশুর ওয়ান ডে'টা বেচারারা দেখতেই পারলো না। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলেই শুরু হয়ে যায়, "এসে গেলি, বাবা ? চ, আজ একবার পারু মাসির সাথে দেখা করে আসি। দু'বছর হয়ে গেল দেখা হয়েছিল। সে বছরই তো পারু মাসির ছোট ছেলের বিয়ে হল। এতদিনে তো মাসি নাতির মুখও দেখে নিয়েছে।"

অতএব সে সূত্রেই আজকে মন্দির দর্শন এপিসোড। ওরা বাড়ি ফিরতেই পুতুল পিসি ঠাকুমাকে বল্ল, "অ কাকিমা, আজ একবার সঙ্কট মোচন যাব। পায়ের বাতের ব্যথাটা নিয়ে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি গো। দেখতেই তো পাচ্ছ। যত ডাক্তার, বদ্যি, হোমিও, হাকিম বল এমনকি ম্যাগনেট তারপর প্রাণিক হিলিং, সবই তো ছাই ভস্ম। যাই, আজ বজরঙ্গবলিকে লাড্ডু খাইয়ে দেখি, যদি তিনি তুষ্ট হন।"

ওদের মা আবার ননদের সঙ্গে মস্করার লোভ সামলাতে পারলেন না, "বলি ঠাকুরঝি, লক্ষ্মণের ট্রিটমেন্টের জন্য পবনপুত্র তো সমস্ত পাহাড়টাকেই মাথায় তুলে নিয়ে চলে এসেছিল। তোমার জন্য কি করবে ? পুরো হাসপাতালটাই না নিয়ে হাজির হয়।"

"যাঃ তুই কি যে বলিস বউ, তার ঠিক নেই।" পুতুল পিসি হাত নেড়েই কথাটাকে উড়িয়ে দিলেন।

রিক্‌শা থেকে অবতীর্ণ হতেই ফুলমালাওয়ালাদের দরাজ গলায় আহ্বান "মাতাজী, এখানেই হাতটা ধুয়ে নিন। আর তারপর...."

কিন্তু পুতুল পিসির প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে গেল, "কি ? আমায় কি বাহুত্তরে ধরেছে না কি ? এটুকুও জানবো না যে হাত ধুয়েই ঠাকুরের ফুলমালা নিতে হয় ? যত্তসব। এ গোলাপের মালাটা কত করে ?"

"কুড়ি টাকা।" ফুলওয়ালা ভাবল ভালো শাঁসালো খদ্দের পেয়েছি।

"উরে বাব্বা। কি বলছ কি ? আর এই বেলি ফুলেরটা ?"

"দশ।" পুতুল পিসি একটু হেসে ভাইপো দু'জনের দিকে দৃকপাত করেন, "পবন নন্দনের কাছে তো

সমস্ত নন্দন কাননটাই পড়ে আছে। এসব তুচ্ছ ফুল মালায় ওনার কিই বা প্রয়োজন ? অযথা পয়সা নষ্ট। এই গ্যাঁদার মালাটা কত করে ভৈয়া ?"

"তিন রুপৈয়া।" ফুলওয়ালার উৎসাহে ভাঁটা।

পুতুল পিসির মুখটা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। মালা নিয়ে পাশের দোকান থেকে সওয়া কিলো বেসনের লাড্ডুও কিনে নিলেন। ভাইপো দু'জন পাশটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে লাল প্যাঁড়া, লবঙ্গলতা, চন্দ্রকলা আর লাড্ডুর থালাগুলো দেখছিল। ভাবলো আগে পুজো, ঠাকুরের দেওয়া হোক ভোগ, তারপর প্রসাদের হবে যোগাযোগ।

কিছুদিন আগেই সংকট মোচনে উগ্রপন্থীরা বোম ফাটিয়ে গেছে। তাই আজকাল দর্শনার্থীদের মেটাল ডিটেক্টারের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। পিসি তার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়লেন, "হে ভগবান এটা কি ?"

একটা পুলিস বোঝাবার চেষ্টা করে, "মাতাজী, ঐ বোম-টোমের জন্য চেকিং চলছে।"

"তা তোমার কি মনে হয়, আমার কাছে বোম লুকানো আছে ?" পিসির যুগল ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

অন্য সেপাইজি হাতে খৈনী ডলছিল, বল্লে, "যেতে দে রে ভাই। ইনি তো নিজেই সাক্ষাৎ অ্যাটম বোম।"

পিসি তার দিকে খানিকক্ষণ কথাকলির চোখ করে চেয়ে রইল। তারপর ভেতরে চলে গেল। পথের দু'ধারে রাস্তায় আর গাছের ওপরে বাঁদরের ভীড়। তারা নিজেদের মধ্যেই খিচমিচ করছে। যেন ভ্রূক্ষেপেই নেই যে কে এলো আর কে মন্দির থেকে বাইরে চলে গেল। ভাবটা যেন মুঝসে কেয়া মতলব ? কিন্তু ওদের দেখে পুতুল পিসির তো চক্ষু চড়কগাছ, "ওরে বাবা, এ কি রে ? কামড়ে দিলে ইনজেকশান লাগাতে হবে যে।"

পেছন থেকে একজন সিপাইজী অভয় দিল, "কিচ্ছু হবে না। ওরা কিছু বলবে না। ভেতরে চলে যান।"

অতঃপর তিনজনে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে হনুমানজীর দর্শন করল, দেবতাকে উৎসর্গ করে লাড্ডুর চাঙারিটা আবার ফেরৎ নিয়ে নিল। পুরুত ঠাকুর দুটি তুলসীর পাতা দিয়ে মিষ্টিটা উচ্ছুগ্যু করে দিলেন। তারপর আবার শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতার দরবারে। শানু সোনুর ভারী খিদে পেয়েছে। তখন থেকে এত ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। যদি অন্তত একটা লাড্ডুই পাওয়া যেত।

এত ঘুরে ঘুরে পিসির পায়ের ব্যথাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফেরার পথে একটা বটতলায় বসে পড়লেন, "দাঁড়া একটু জিরিয়ে নিই রে। ওহ।"

দুই ভাইয়ের দারুণ আশা -এবার বুঝি লাড্ডু মিলবে। ইতিমধ্যে..

খ্যাঁ খ্যাঁ, কিচমিচ খোঁ খোঁ... অঙ্গদ সুগ্রীবের সেনা বাহিনী গাছগুলোর ডাল থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে এল। তাদের চক্রব্যুহের মাঝে পুতুল পিসি একলা অভিমন্যু। তাদের যেন দাবি "কি ব্যাপার আমাদের খাওয়াবেন না ? আমাদেরও তো একটা হিস্সা আছে।"

তাই না শুনে পিসির পরিত্রাহি, "উল্লে বাবারে কামড়ে খেলে রে। অ শানু, ও বাবা সোনু, এদের ভাগা না। আরে কোই হ্যায় ?" পিসির চোখে জল।

কিন্তু ওরা দুই ভাই কিই বা করে ? শুধুমাত্র লাড্ডুর জন্য কি কেউ শহিদ হতে পারে ?

ততক্ষণে একটা গোদা বাঁদর গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে পিসির হাত থেকে এক ঝটকায় মিষ্টির চেঙারিটা ছিনিয়ে নিল। ভাবটা যেন - পান্ডাদের দক্ষিণা আছে, আমাদের পাওনা নেই ? ওদিকে গোদাটার চতুর্দিকে কচি কাঁচাদের ভিড়, ও দাদু, ও জেঠু, ও বড়মামা, আমাকেও দাও না গো। দু'একজন হাত বাড়িয়ে দু'একটা লাড্ডু বাগিয়েও নিল। পরক্ষণেই গোদার দাঁত খিঁচনি দেখে দিল দৌড়।

দু একটা মা নেওটা মা মাসির কাছে নালিশ জানাচ্ছে, "দাদা নিয়ে পালালো। আমায় দিল না অ মা-"

কিচ কিচ খিচ খিচ কুরুক্ষেত্র ভারী, লাড্ডু পাওয়ার লাগি কত কাড়াকাড়ি...

ওদিকে পুতুল পিসির পরিত্রাহী আবেদন আর্জি - "ভাই সা'ব উস বন্দর সে জেরা মেরী মেঠাই..."

দুই ভাই অশ্রুপূরিত চক্ষে চেয়ে চেয়ে প্রত্যক্ষ করছে- দেবতার গ্রাস। হে লাড্ডু, বিদায়। বিদায়। তুমি আমাদের হলে নাকো হায়।

ইতিমধ্যে সেই পুলিসদের একজন পান চিবুতে চিবুতে এসে হাজির, "এ মাতাজী, কেন অযথা হায় হায় কচ্ছেন ? একবারটি ভেবে দেখুন তো আপনি কত বড় পুণ্যাত্মা। ক'জনের ভাগ্যে এরকমটা ঘটে, অ্যাঁ, স্বয়ং বজরঙ্গবলী আপনার হাত থেকে মিষ্টি নিয়ে খেলেন। যান, এবার খুশি মনে বাড়ি ফিরে যান।"

একেই কি বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া ?

শানু সোনুর চোখদুটো ছল ছল করে উঠল। হে লাড্ডু, আমরা তোমাদের ভুলিনি, ভুলতে পারবোনা।

দুটো বাচ্চা বাঁদর মায়েদের পিছু পিছু যেতে যেতে এই দুই ভাইকে যেন চোখ দিয়ে বলতে চাইল, "থ্যাঙ্কু ভৈয়া, আবার কবে খাওয়াচ্ছো ?"

গোপাল কুম্ভকার
ভূতের গুঁতো

ভূতের গুঁতো খেয়ে সেদিন কামার পাড়ার হাবু
রাত দুপুরে শ্মশান ধারে বেজায় হল কাবু।
গা-গতরে দারুণ ব্যথা, বাক্-ও নীরব হল।
পায়ে কাঁপন — ঝড়ে যেমন নৌকা টলোমলো।

বদ্যি এসে দেখে শুনেই বিধান দিল হেঁকে
ভূতের ছানার রক্ত এবং পেঁচার খিলু মেখে —
মলম করে মাখানো চাই সকাল দুপুর রাতে
তবেই এ রোগ সারবে জেনো — প্রমাণ হাতে হাতে।

আজ থেকে জোর তালাশ করো শ্যাওড়া গাছের ঘরে
দু-একটা ঠিক ভূতের ছানা দেখবে খেলা করে
তাদের ধরে আনলে আমি সিরিঞ্জ টেনে কিছু
রক্ত নিয়েই খেল্ দেখাবো — হটবে ব্যামো পিছু।

বিষ দিয়ে বিষ তুলতে তো হয়- কাঁটা দিয়েই কাঁটা
ব্যাপারটা তো সবার জানা - হিসেব সাদামাটা।

তপন্ দাস্
মুখটা তেতো নিম

হাট্টিমা টিম টিম কাঁসর বাজায় ভীম,
খালি গায়ে ছোট্ট পায়ে নাচছে ছাদে রিম।
কোথায় পাখির ডিম ? ঝুলছে গাছে শিম
মায়ের কাছে বকা-খেয়ে মুখটা তেতো নিম।

দিগম্বর দাশ্গুপ্ত
কুঁড়ের প্রার্থনা

কুঁড়ে এক ভক্ত বলে প্রণাম করে মা-কে
"এমন কিছু কাজ দিয়ো মা, যে কাজ আমাকে —
করতে কিছুই হবে নাকো, অন্যেরা যা করার
করবে সে কাজ, তুমি শুধু পকেটটা মা ভরার —
ব্যবস্থাটা করে দিও।" তার কথা মা শুনি
ই-মেল করে জানিয়ে দিলেন ভক্তকে তক্ষুনি।
"সস্তা রকম শৌচাগার" এক পথের মোড়ে খুলে
বস্ গিয়ে তুই, কাজ না করে একটা উঁচু টুলে।
ভক্তটি তাই শুনে এখন, করছে কামাই রোজ
গড়েতে দিন একশো টাকা, নিলাম গিয়ে খোঁজ।

নিতাইচন্দ্র রজক
পুব রেঙেছে

পুব রেঙেছে আবির গুড়োয় টুকটুকে লাল উঠছে রবি,
মেঘ নেমেছে পাহাড় চুড়োয় রঙিন আলোর আঁকছে ছবি।
ভোরের বেলা শিশিরগুলো ঘাসের পরে জিরোয় খানিক,
সোনালি রোদ যেই না ছুলো সব হয়ে যায় মুক্তো মানিক।
নীল আকাশে মেঘ্রা মাতে সাদা সাদা ডানা মেলে
মিলেমিশে রোদের সাথে হঠাৎ লুকোচুরি খেলে।
স্বচ্ছ জলে ভরিয়ে বুক নদী ছুটে কুলু গানে,
খুশি মজায় জড়িয়ে সুখ উৎসবেরই খবর আনে।
ধরার সবুজ উঠোনেতে শিউলি ঝরে গাছের তলে,
শীতের ছোঁয়া বাতাসেতে পাঁপড়ি খোলে কমলদলে।

কথার প্যাঁচ - প্রণব হোড়

বিকাশচন্দ্র দাস্

চোখেতে পড়েনি কুটি

আমি ফিরে যাই আমাদের গাঁয়ে
চৌরাস্তার মোড় —
বন্ধুরা থাকে, হাত নেড়ে ডাকে
ফেলে-আসা কৈশোর।
ভোরের কুয়াশা রাস্তাকে দিত
লাজুক ঘোমটা টেনে,
কেউ নেই, শীতে দোকান খুলেছে
তবুও রতন বেনে।
কামারশালাতে ফৌদি মিস্ত্রি,
সঙ্গি ছেলটা রাম,
গাড়ির চাকাতে হাতুড়ি পিটোয়,
টসটস ঝরে ঘাম।
বিষ্টি উধাও, আশ্বিন শেষ,
মরেছে নয়ানজুলি,
দিগন্তে মাটি আকাশের সাথে
করে জোর কোলাকুলি।
আবু খাঁ আজানে কান পেতে থাকে,
বিলকিস ডাকে, নানা,
তাড়াও এখুনি, সবজি খাচ্ছে
দুষ্টু ছাগলছানা।
বাবা হাঁক পাড়ে, দোকানেতে আয়,
আমি বেহিসাবি ছুটি —
ঘুম ভেঙে গেলে চোখদুটো মুছি,
চোখেতে পড়েনি কুটি।

কাজী শাহাদাত আলী

ইঁদুর ছানা

লাফায় দাপায়
ঘুরে বেড়ায়
কাটুস কুটুস
বই-এর পাতায়
ছাদের পরে
হেসেল ঘরে
দিচ্ছে কেবল হানা,
অনেক ইঁদুর ছানা।

সুকান্ত ঘোষ

ছড়ানোর ছড়া

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব ?
চার ছড়ালে মাছের ?
চাল ছড়ালে পাখির অভাব ?
বীজ ছড়ালে গাছের ?
টাকা ছড়ালে সব পাওয়া যায়
নাম ছড়ালে কদর,
গুড় ছড়ালে পিঁপড়ে আসে
কলা ছড়ালে বাঁদর।

শ্যামাচরণ কর্মকার

যে ছেলেটা

যে ছেলেটা পা রাখে না
বাড়ির আশেপাশে
সে বোঝে কি বাইরের টান ?
কোত্থেকে তা আসে ?

যে ছেলেটা যায়না মাঠে
মাড়ায় না তার ধার
হাতছানি দেয় মাঠ কি তাকে ?
ডাকে বারংবার ?

যে ছেলেটা নিত্যি ঘরে
আঁকড়ে থাকে বই
সে ছেলে কি ঘরকুনো হয় ?
কেউ হয় তার সই ?

হিজিবিজি প্রশ্ন এমন
যেই মনে দেয় উঁকি
খোকা কেমন আনমনা হয়
দেখলে লাগে দুখি !

সুদর্শন মাজি

বিচিত্র ধ্বনি

লালে লাল কত ডাল ফুল ফোটা ফাগুনে,
টগ বগ ফুটে ভাত গনগনে আগুনে।
আনচান করে প্রাণ আকুপাকু মনটা,
আইঢাই করে বুক থমথমে বনটা।
ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে গাড়ি পাড়ি দেয় সুদূরে,
হাট করে থমথম, মাঠ করে ধূ ধূ রে।
বৃষ্টির ঝিমঝিম বর্ষার ঝমঝম,
ভাল্লাগে হলঘরে গমগম সমাগম।
কিলবিল করে পোকা খালবিল পুকুরে,
খিলখিল হেসে ওঠে তুলতুলে খুকু রে !
ঢক ঢক জল খায় ডাকাবুকো ডাক্তার,
রোদ পেলে চমকায় চকচকে টাক তার।
ভন ভন মাছি ওড়ে, শন শন হাওয়াতে,
গিজ গিজ কারা করে দাউদের দাওয়াতে ?
বনবন মাথা ঘোরে হন হন হাঁটলে,
চাটনিটা হবে শেষ চটপট চাটলে।
টনটন করে ফোঁড়া আগাগোড়া শক্ত,
টকটকে লাল মুখে থকথকে রক্ত।
ওই শুনি অশনির ঝনঝন ঝংকার,
ঝড়ঝড় কড়কড় টং টং টংকার।
বক বক বকবে না, ঠকবে না কিছুতে,
ঠকঠক ঠুকো লাঠি ঠিকঠাক পিছুতে।
ধুকপুক করে বুক, ছমছম শরীরে,
ঝমঝম বৃষ্টিতে আয় মজা করি রে !
টকটকে লাল চোখ লকলকে জিভ তার
ভাবলেই দুরু দুরু কম্পন বুকটার।
ঘেউ ঘেউ করে কেউ, কেউ না সে কুকুরে
মড়মড় ভাঙে ডাল জানি এইটুকু রে।
ঠকঠক কাঁপে বক কনকনে ঠান্ডায়,
থকথকে জেলি থাকে ধবধবে আন্ডায়।
চকচক করে সোনা ঝলমল আলোতে,
জ্বলজ্বল জ্বলছে কী ঘুটঘুটে কালোতে ?

অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী

চোর

চোর ঢুকেছে অন্ধকারে বিষ্টুবাবুর ঘরে,
বাড়ির লোকে হাতে নাতে চোরটাকে তাই ধরে।
চোরকে ধরে শাস্তি দিতে সবাই ছুটে আসে —
ধরা পড়ে চোর বাবাজি কাঁপতে থাকে ত্রাসে।
বল্লে সবাই, পুলিশ ডাকো, পাঠাও ওকে জেলে
ঢুকলো ঘরে করতে চুরি এইটুকু এক ছেলে।
বল্লে ছেলে, কান্না মুখে, চোর তো আমি নই
কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে যায় গরিব বড় হই।
মিথ্যা আমি বলছি নাতো সত্যি কথাই বলি
অনুগ্রহ করে যদি দেখেন আমার থলি।
চোরের কথায় থলি খুলে দেখলো লোকে সবই
থলি থেকে বেরিয়ে এলো কবিগুরুর ছবি।

নূপুর সরখেল

অনিক-বানিক

অনিক-বানিক শোনরে খানিক,
সাইকেল নিয়ে যাসনে মানিক।
মোটু-পাতলু দেখনা ঘরে,
এগরোল দেব একটু পরে।

অংশুমান চক্রবর্তী

কয়লাখনি

মাটির নীচে অন্য জগৎ, কালো রং-এর হিরে
শ্রমিকরা সব গভীর খাদে নামছে ধীরে ধীরে।
কয়লা তোলার কাজ করছে জীবন নিয়ে হাতে
কাজ চলছে সকালবেলায়, কাজ চলছে রাতে।
নামছে ডুলি, নামছে মানুষ, কয়লা তোলা হয়
শ্রমিক যারা, তাদের এখন লাগে না আর ভয়।
মাঝে মাঝে বিপদ ঘটে, কি আর করা যায়
মাটির নীচে কাজ চলে রোজ সকাল-সন্ধ্যায়।
ভয় পেলে কি কাজ চলবে ? আসবে ঘরে ভাত ?
হাসি মুখে কয়লা তোলে সকাল থেকে রাত।

বসুন্ধরা মাজি

প্রার্থনা (প্রয়াত ক্রিকেটার অঙ্কিত কেশরীকে স্মরণ করে)

মন কেমনের একটা বিকেল, থেমে গেছে ভায়োলিন।
সবুজ ঘাসেতে স্তব্ধতা শুধু, বড়ই শোকের দিন।
অঙ্কিত আর ফিরবে না জানি, ঝরে যে দীর্ঘশ্বাস
এপ্রিল, তুমি মোটে ভাল নও, ক্রিকেটের কালো মাস।
প্রিয় ব্যাটগুলো পড়ে আছে একা, বলটা ডাকছে আয়,
ছেলেটা যে আজ চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে গিয়েছে হায়।
কত আশা ছিল ভারতের হয়ে জিততে ঝরাবে ঘাম —
নিউজ পেপারে প্রথম পাতাতে ছাপা হবে তার নাম।
কিন্তু মৃত্যু সেই স্বপ্নকে করে দিল খন্ডন,
মাত্র কুড়িতে থেমে গেল তার জীবনের স্পন্দন।
খেলার মাঠই কি খুব ভালবেসে কেড়ে নিল তাকে তাই ?
সব কাগজের টাইটেল পেজে পেয়ে গেল ঠিকই ঠাঁই।
ময়দান জুড়ে চাপা গুঞ্জন, সমবেদনার ভিড়—
সময়ের স্রোতে বদল হবে কি এ করুণ ট্র্যাজেডির ?
খেলার মাঠেতে আর কারো যেন এভাবে না ঝরে প্রাণ —
এইটুকু শুধু প্রার্থনা করি, শুনো তুমি ভগবান।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

চুপটি করে শোনো

বাড়ি ফিরে ভাল্লাগেনা, মন ছটফট করে
হায়রে আমি বন্দি এখন মস্ত পড়ার ঘরে।

পড়ার ঘরে একাই আমি মনটা পড়ে মাঠে
সেইখানেতে আমার প্রিয় সময়গুলি কাটে।

সকাল হলেই সূয্যিমামা হাসে আলোর হাসি
বাঁশের বনে দোয়েল, কোকিল বাজায় খুশির বাঁশি।

মাঠের পরে মাঠ গিয়েছে জানিনা কোন্ দেশে
মন হারিয়ে যাই চলে তাই দূরে নিরুদ্দেশে।

সেইখানেতে আমার সময় আমার নিজের মতো
খবরদারি করবে না কেউ বাবা-মায়ের মতো।

এসব কথা তোমায় বলি, চুপটি করে শোনো
মায়ের কানে, বাবার কানে, বোলো না কক্ষনো।

সলিল মিত্র
নিয়মে চলার শপথ নাও

ভূমিকম্প ও বন্যা সুনামি —
মানুষ কি ভাবে বাঁচবে
সবুজে সবুজে সবুজায়নের
রূপে অপরূপে সাজবে ?

প্রকৃতির সাথে মানুষ এখন
চ্যালেঞ্জ নিয়েছে দেখি —
যত নিয়মকে বেনিয়ম করে
নিত্য চলেছে — একি !

আকাশে বাতাসে বিষের বাষ্প
স্বচ্ছ নেইকো হাওয়া,
উদাসী বাউল — কন্ঠে যে তার
থেমে গেছে গান গাওয়া।

প্রকৃতির কাছে অবহেলা নয়,
ঠিক বিজ্ঞান শিখে
নিয়মে চলবো এ কথাটা তুমি
ডাইরিতে রাখো লিখে।

স্বপনকুমার বিজলী
লাগলে দোলা শুভ্র কাশে

লাগলে দোলা শুভ্র কাশে
শিউলি ঝরে ধানের পাশে
ভোরের আলোয় আলপনা ঠিক
আঁকা।
লাগলে দোলা শুভ্র কাশে
সাদা মেঘে মুচকি হাসে
রুপোর চাদর সারা গায়ে
ঢাকা।
লাগলে দোলা শুভ্র কাশে
দিঘির জলে পদ্ম ভাসে
আগমনির মায়াবী রোদ
মাখা।
লাগলে দোলা শুভ্র কাশে
পুজো পুজো গন্ধ আসে
ঢাকে কাঠির অপেক্ষাতে
থাকা।

রামচন্দ্র ধাড়া
ভাজগড়া

ভগ্ন দেহ সারছে না, তাই
বললেন ডাক্তার,
মধুপুরে গিয়ে থাকুন
সপ্তাহ তিন-চার।
চাকর সঙ্গে নিয়ে বাবু
গেলেন মধুপুর,
ভালো একটা বাড়ি পেলেন
শহর থেকে দূর।
কাছেই আছে কতকালের
কেল্লার স্তূপ,
জ্যোৎস্না রাতে দেখা যায় তার
কী অপরূপ রূপ।
ঐ কেল্লার পিছন দিকে
ভাজ পাকার ঘাট,
তারপর এক ধূ ধূ করা
ফাঁকা বিশাল মাঠ।
সেই মাঠেতে হেঁটে এবং
সেই ঘাটেতে স্নান-
করে বাবু সুস্থ হলেন
বেঁচে গেল প্রাণ।

সোমনাথ নন্দী
বউ-এ আর বরে

মাসি নেই, পিসিও নেই
ছিমছাম ঘরে,
খাসা কত বাসা বাঁধে
বউ-এ আর বরে।
ব্যাজার বাপে বাজার করেন
মা-ও খেটে মরেন,
নাতি সাহেব ঘটা করে
পড়তে গেছে ফরেন।
বাজে কাজে বেলা গেল
রাতও হল শেষ,
ভোর বলে তোর কপালে
দুঃখ অশেষ।

ত্রিদিব ঘোষ রায়
প্রজাপতি

প্রজাপতিটা পাখনা মেলে
বসছে গাছের ডালে,
আনন্দেতে খুকুমনি
নাচছে তালে তালে।
উড়তে উড়তে আবার সেতো
খুকুর কাছে আসে।
চুপটি করে বসলো এবার
ছোট্ট খুকুর পাশে।
দু'চোখ ভরে দেখছে তাকে
কত রং-এর বাহার,
ভাবছে খুকু আপন মনে
কি করে সে আহার।
প্রজাপতি বলছে তাকে
ভাবছে শুধু শুধু
ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াই
খাই যে তাদের মধু।

শিশির সাঁতরা
অন্ধকার

পরশু রাতে চেঁচিয়ে ওঠে
পাগলা দাশুর ভায়রা ভাই,
বুদ্ধু ভূতুম ভূতের মাসি
আসছে তেড়ে কেউ যে নাই।
কি করি যে কাকে ধরি
এমন সময় উঠল ঝড়
দুলছে দোদুল ভীষণভাবে
দুলছে মায়ের ঠাকুর ঘর।
জানলার কাঁচে ভাসছে দেখি
আবছা আলোয় মুখের ছায়া
ঘরের ভেতর ঠকঠকিয়ে
কাঁপছে টিভির তিনটি পায়া।
হচ্ছে যা হয় হোক না কিছু
অন্ধকারটা যাক না চলে,
ঘুম ভাঙলে উঠুক সুয্যি
দেখবো ওসব সকাল হলে।

শীলা মুখোপাধ্যায়

তিনজন সারাদিন

ফন্দি সন্দি আন্না,
সকালেই জুড়ে দিল কান্না।
চিৎকার চেঁচামেচি
ঘুম ভেঙ্গে ছুটে গেছি –
ছোট্‌দাদু রেগে বলে থাম্‌ না।
ফন্দির নাকি সুর
সন্দির আমচুর
মাঝখানে ভ্যাবাচ্যাকা আন্না।
ছোট্‌ দাদু কোত্থেকে
বাজখাই হেঁকে ডেকে
বলে ওরে, কান ধরে টান না।
ফন্দি সন্দি আন্না
খেতে বসে দাওয়াতে
মন নেই খাওয়াতে
মা এল শেষ করে রান্না।
ও পাশেতে হৈ-চৈ
দাদু বলে দই কই ?
ছোট্‌ দাদু দই ছাড়া খান না।
তিন জন শুতে গেল
দিদি গায়ে ঢাকা দিল,
তক্ষুনি দিদা এল
ছোট্‌ দাদু হেসে বলে,
হাতে ও কি পান্না ?

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

চৌপদী

সাত নদী পঞ্চ পীঠ
লাল মাটির বীরভূম,
আউল বাউল পৌষমেলা
শালবনে পড়ন্ত বেলা।

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

তেমন ছেলে

কাজের বেলা লবডঙ্কা
কথার বেলা বড়ো,
এমন ছেলেছোকরা এখন
বেশ হয়েছে জড়ো।
কাজের আগে যুক্তিতক্কো
হাজার রকম করবে,
সময়কালে সবকটা ঠিক
উড়ুৎ-ফুড়ুৎ সরবে।
অথচ চাই তেমন ছেলে
কথায়-কাজে মিল,
ঘরের কোণে মেঘ দেখলে
আঁটবে না কো খিল।
এ-দেশ মাটি ভালোবাসবে
ভালোবাসবে মানুষ,
প্রয়োজনে উচ্চশির
হবেও নতজানু।
তেমন ছেলে কবে হবে
খুঁজি, কেবল খুঁজি —
ধরবে দু'হাত, বুকে নিয়ে
ভালোবাসার পুঁজি!

বিধান সাহা

শারদীয়া

যাবার সময় বলেছিলাম
আবার শরৎ এলে,
আসিস মাগো এই ভুবনে
খুশির পাখা মেলে।
সারা বছর মনে মনে
প্রহর গুনে চলা,
শরৎ এলে খুশির ঝলক
আবার তোকে বলা।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা
রোদেও চমক লাগে,
শরৎ এলো আর দেরি নেই
মনেই সাড়া জাগে।

তারাশংকর চক্রবর্তী

জলকুয়াশার মেঘ ঝরে গুঁড়হা গুঁড়হা

ঝাঁড়গাঞে থাকে আমার বকুল মাসি
দাঁড়বাঞে দাদা লৌকা আইনছে তীরে,
নীলপাহাড়ির চূড়হায় য্যা গাঙ্‌চিল
মিল কইরে পড়হে কবিতাকে ঝিলমিল।

ঝিলমিল মানে রচনা দিদির বুনি,
কিলবিল কইরে সাপ চলে যায় জলহে,
ঢেউ লিঞে দুলহে দুফুর ব্যালহার রোদ
ঘেউ ঘেউ ডাকে কুকুর মনসা তলহে।

শরবনে ফিঙ্যা সুর তুইলে সুর ভাঙে
ওর মনে থাকে আকাশ জয়ের হাসি,
পাশের দিঘিতে ঢেউ তুইলে দীখা কি যে
কাশের কুসুমে জোস্‌না পইড়ছে রাশি।

ফাউল কইরেছে গোল দিতে যাঞে ভজা
বাউল গানের আসরে মজবে মজা।
আজ চোপরাত শিশির ঝইরবে নিশির
রাজ খাবি আয়, গরহম তেলের গজা।

শিউলির ফুলে শরৎ বাজায় ঢাক
বিউলির ডালে ভাত মাখ্যে খায় মাসি,
জল কুয়াশার ম্যাঘ ঝরে গুঁড়হা গুঁড়হা
চল-সু আশারলইদী লিঞে ঘুইরে আসি।

কাজল কুশারী

অচিনপুরে পৌঁছে গিয়ে

এগিয়ে চলো আর থেমো না আজ যে তোমার থামতে মানা,
অচিনপুরের দেখা পেলে জানিয়ে দিও তার ঠিকানা।
বন জঙ্গল পাহাড় নদী পেরিয়ে সে সব এগিয়ে চলো,
অচিনপুরের দেখা পেলেই তার কথা সব আমায় বলো।
মনের ভিতর কল্পনাতে অচিনপুরের কতোই ছবি,
ভাসছে শুধু হাসছে শুধু কোনদিনই হইনি কবি।
নইলে মনের ছবিরা সব ছড়া হয়ে উঠত ফুটে,
ছড়াগুলো ফুল হতো যেই মৌ-ভোমরা আসতো ছুটে।

দেবাশিস দন্ড

অবিশ্বাস্য অবিনাশ্য

বাগবাজারে বিগ বাজারে বিশ বাজারে ঘুরে
পেলেন নাকো ব্যাজার দাদা হাজার মাথা খুঁড়ে।
ভাল থাকার মেশিন কি আর যায় সহজে পাওয়া
ভাল থাকার দাওয়াই আছে আমার কাছে বাওয়া।
চাইলে পরে বলতে পারি, বলব নাকো সেধে
কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে নিও প্রাচীন আয়ুর্বেদে।
চামচিকেদের ছায়া এনো — এক সিকি দাম মোটে
তাহার সাথে দেড় পোয়া রোদ আচ্ছা করে বেটে...
উন্না থাক, শুনতে না চাও বলব নাকো যেচে
বিশ্বেস না হলে তখন সবই যাবে কেঁচে।
নক্সভম টু থার্টি মেশাও পৌনে চারি ফোঁটা
অ্যাই তো তোমার স্বভাব খারাপ, বলতে গেলেই খোঁটা।
তারপরে সব ঘেঁটেঘুটে রুমালে দাও ঢেলে
রুমালটাকে শুকিয়ে নিও ঈশান কোণে মেলে।
সোয়া সত্তর মিনিট নিও, কম বা বেশি নয়
তাইলে পরে প্ল্যান চৌপট, লাইফ ধনঞ্জয়।
রুমালখানা মেলবে যদি ভুল করে নৈঋতে
ভাল করতে কেলো হবে মাসুল দিতে দিতে।
কৃষ্ণা পঞ্চমী রাতে বারোটা ছত্রিশে...
বলব না ধ্যাত, বললে তোমার সবই লাগে ক্লিশে।
রুমালে দাও তুলসী রসের তিনশ তিরিশ ড্রপ
এপ্পরে দাও খাঁচায় মেলে ঝপ ঝপা ঝপ ঝপ।
খাটাখাটনি ঢের করেছ, ঘুম পায় না ছাই ?
সাত সকালে ঘুম ভাঙাবে হুলো বেলালের ভাই।
বেলালটাকে মহালয়ার সাড়ে চার মাস আগে
টুকুস করে ছেড়ে এস পাঁচ নম্বর দাগে।
পাঁচ নম্বর ? সেইডা কোতায় ? শ্রী পঞ্চাননতলায়
না বুইলে তকন আমার খুঁত ধরবে বলায়।
পঞ্চাননে মস্ত পাঁচিল... বেলালটাকে ছেড়ে
সোওজ্জা ঘরে চলে এস হাত দু'খানা ঝেড়ে।
মনখারাপটা উড়তে উড়তে মন্তেশ্বরির পাশে
তাপ্পরে ভুস পালিয়ে যাবে হুই যে মহাকাশে।
অবিশ্বাস্য অবিনাশ্য আয়ুর্বেদিক দাওয়া
নিকটবর্তী দোকানে আর যায় না এখন পাওয়া।

বিকাশ পন্ডিত

এক রাতে

সেদিন রাতে সায়ন্তিকা মামার বাড়ির কাছে,
দেখতে পেল চাঁদ দুলছে উঁচু শিরিষ গাছে,
চাঁদ ধরতে তাই ছুটেছে মূল ফটকের পাছে।

গিয়েই দেখি চাঁদ তো নেই, রাতজাগা এক পাখি
জোছনা রঙে রাঙিয়ে নিয়ে নিজের দু'খান আঁখি,
মিঠেল সুরে দেয় ভরিয়ে সবুজ সবুজ শাখি।

পাখির গানে মুগ্ধ ভুবন মুগ্ধ রাতের হাওয়া
গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি নিবিড় করে পাওয়া
ইচ্ছে করে ওরই সাথে হোক না গান গাওয়া।

নয়নতারা তন্তুবায়

ছড়ায় ছড়ায় ছড়িয়ে দিলাম

ছড়ায় ছড়ায় ছড়িয়ে দিলাম হাসি খুশির রেখা,
মায়ের মুখের মিষ্টি হাসি সরল পথে শেখা।
ছড়াই পারে ফুল ফোটাতে শিশুমনের অলি,
গোলাপ-গাঁদা-চাঁপার কাছে পদ্ম ফোটা কলি।
ছড়ায় ছড়ায় উড়িয়ে দিলাম সুখের পোষা পাখি,
মনের মাঝে মিহিসুরে করছে ডাকাডাকি।
ছড়ায় ছড়ায় বাউল গেয়ে আসছে রাঙা ফাগুন
ছড়ায় ছড়ায় জড়িয়ে আছে বুকের চাপা আগুন।

বাপ্পাদিত্য পান্ডে

মানুষগুলো

মানুষগুলো বেজায় ভীতু যেই না নামে রাত,
মুখ লুকাবে বিছানাতে হয় যে কুপোকাত।
গায়েও তাদের জোরটি নেই চিবোয়নাকো হাড়,
এসব দেখে ইচ্ছে করে দিতেই তাদের মার।
চেহারাটাও বিদঘুটে যে অনেক রকম রঙ
এসব নিয়েই মানুষগুলো দেখায় এত ঢঙ।
আমরা হলাম ভূতেরা সব নেইতো কোন ভয়
শক্ত হাড়ও খাই চিবিয়ে রাতকে করি জয়।
আমরা আবার খুবই ভালো, লম্বা দুটি হাত
দিন দুপুরে ঢিলটি মেরে করি বাজিমাত।
তাইতো আমরা ভূতেরা সব গাইছি দেখ গান,
ভীতু ভীতু মানুষ মেরে বাড়াই ভূতের মান।

প্রবীর জানা
লাগছে অদ্ভূত

চোখ ঢুলু ঢুলু মাঝরাতে যেই
ভাঙল ঘুম ঘুকুর,
যাচ্ছে শোনা বাজছে যেন
দূরে কোথাও নূপুর।
গা ছম ছম আঁধার মাঝে
দাঁড়িয়ে আছে দোরে,
কারা যেন মারছে চাঁটি
মাথার ওপর জোরে।
ভাবছে খুকু দৈত্য-দানব
নয়তো এরা ভূত
গভীর রাতে ঘটছে কিসব
লাগছে যে অদ্ভূত।
মা বললো গান ধরেছে
ছুঁচো নূপুর সুরে,
চামচিকেরা পড়ছে মাথায়
যাচ্ছে যখন উড়ে।

অসীম আচার্য
হয়ে উঠুক

যাবার সময় আমি যখন
বলতে পারি নাকো
কোথায় যাবে যাবার সে পথ
বলতে পারি, থাকো।
অনেক কথাই কথার মত
সব রয়েছে জমে
এবার তবে তা হলে হোক
এগোক তো সম্ভ্রমে।
মায়ার মত সব কিছু কি
এমনি রয়ে যাবে ?
মনের কথা মনের মাঝে
কোথাও তো আটকাবে !
এবার না হয় খোলা পথে
চলুক তো পথ চলা
সঙ্গে কিছু উঠুক জমে
বিশুদ্ধ হাটতলা।

রমেন রায়
আমি কবে বড় হব

সবাই বলে ছোট তুই
পড় অ আ ক খ,
লেখাপড়া শেখ তুই
শিখে আগে বড় হ'।
খালি খালি লেখাপড়া
আর কোন কাজ নেই ?
বাবার মতো যেতে পারি
আমিও অফিসেই।
ঠামার মতো গাইতে পারি
হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
দাদুর মতো বলতে পারি
আনরে ভোলা হুঁকো আন।
তবুও তোমরা আমাকে
ছোট বলেই ভাবো
সবাই যদি এমন করে
কখন বড় হব ?

রাজকুমার সরকার
দরিদ্রসেবা

অনেক রকম সেবা আছে
জীবের সেবাই প্রধান,
দীন-দুঃখীর মাঝেই জেনো
রয় সে ভগবান।
আগে জীবের সেবা করো
তারপর ভাই অন্য,
দরিদ্রকে করলে সেবা
জীবন হবে ধন্য।

জগদীশ মন্ডল
জাগিয়ে রাখি

আসছে শরৎ মেঘ পরেছে
বিদায় নেবার সাজ,
তুলি হাতে আঁকছি ছবি
তার-ই কারুকাজ।
মেঘ জুড়েছে মেঘের গায়ে
একটি জুড়ে হাল।
নিরুদ্দেশে চলছে ভেসে
পেঁজা তুলোর পাল।
যাচ্ছে ওরা খবর দিতে
শিব ঠাকুরের দেশে,
দুগ্গা মা'কে আনবে না রে
নীল আকাশে ভেসে।
শিউলি ফুল উঠছে জেগে
শিশিরে পা ধুয়ে,
দুগ্গা দেবীর আগমনে
গড় করছে নুয়ে।
ধনী-গরিব সবার মনে
পড়ল খুশির সাড়া
পুজোর ক'দিন সবাই মিলে
জাগিয়ে রাখি পাড়া।

অলক দাঁ
ছড়া

ঝপাস করে পড়লো জলে
সোনা ব্যাঙের ছানা,
বকটা ভাবে মাছ লাফালো
উড়লো মেলে ডানা।
কলমি শাকের দলে ছিল
ঢোঁড়া সাপের বাচ্চা,
বকটা দেখে তিড়িং করে
লাফ দিলো সে আচ্ছা।
নাকটা তুলে ব্যাপার দেখে
ল্যাটা মাঝের ধাড়ি,
বককে দেখে ভয়েই কাঁপে
প্রাণটা যাবে ছাড়ি।

সন্দেহবাতিক মনোহরবাবু

সৌম্য নারায়ণ আচার্য

ইদানিং মনোহরবাবুর বাতিকটা একটু বেড়েছে। আগে রাস্তায় বেরোনোর আগে মনোহরবাবু জানালা দিয়ে বাড়ির চারদিকটা দেখে তবেই বেরোতেন। দরজাটা লাগানোর পর অন্ততঃ বার দশেক ঠেলা মেরে দেখে নিতেন যে ওটা ঠিক মতো বন্ধ হয়েছে কিনা।

মনোহরবাবু থাকেন দোতলায় আর তাই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় গুনে গুনে নামেন যাতে পড়ে না যান। সিঁড়িতে পা রাখার আগে দেখে নেন যে ওতে কেউ দুষ্টুমি করে বালি-টালি কিছু রেখে দিয়েছে কি না। কারণ বালি থাকলে উনি পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন। তবে এখন তো ওনাকে সবাই পাগল ভাবতে শুরু করেছে।

কারণ, রাস্তায় পা দিতেই উনি প্রথমে ডানদিকে ও পরে বাঁদিকে বার দুয়েক দেখে নিয়ে তবেই ফুটপাথে পা রাখেন। তারপর আবার উপরেও তাকানো চাই। প্রথমটা যে কোনো শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আর দ্বিতীয়টা কারো ছোড়া ঢিল থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। এছাড়া যদি উড়ন্ত কাক বা চিল প্রাকৃতিক কাজ করে দেয় তা থেকেও তো বাঁচতে হবে। প্রথম প্রথম গিন্নি বলতেন, তুমি তো কারোর পা-ও মাড়াও নি, কারো সাথে শত্রুতাও করো নি। তাহলে তোমাকে কে আক্রমণ করবে ? এই ধরণের মিথ্যা ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করো। কেউ তোমাকে আঘাত করবে না।

শুনে মুচকি হেসে মনোহরবাবু বলেছিলেন, আজকাল কে যে কাকে আক্রমণ করে, তার কোনো ঠিক নেই। তাই আগে থেকেই তৈরি থাকতে হয়। এই তো সেদিন, ঘোষবাবুকে কে বা কারা যেন ছুরি দেখিয়ে ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে গেল। উনি যদি আমার মতো হতেন তাহলে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতেন। সবার এমন বুদ্ধি নেই গিন্নি।

সিঁড়িতে চড়বার আগেও উনি ভালো করে দেখে নিয়ে তবেই পা রাখবেন। যদি ওতে কেউ দুষ্টুমি করে জল ফেলে দিয়েছে বা যদি ওটা ভেঙ্গে গিয়ে থাকে তাহলে তো সমূহ বিপদ। তাই প্রতিদিনই বার কয়েক ওপরে ও নীচে ভালো করে দেখে নিয়ে তবেই সিঁড়িতে পা রাখেন। আবার আজকালের ঝুলন্ত সিঁড়িতে তো চড়তেই চান না। বলেন, যদি ওপরে ওঠার পরে ওটা ভেঙ্গে যায়, তাহলে কি হবে ? আমি নীচে নামবো কি করে ?

উনি কারো কথা শুনবেন না, তাই গিন্নি তো বটেই ওঁর দুই ছেলেও আজ বাবাকে কিছু বলেন না। তবে পাড়া প্রতিবেশিরা যখন ঠাট্টা করে তখন খারাপ লাগে।

আজ বাড়ি থেকে বেরিয়েই মনে হল যে তাঁর ঠিক ডান দিকে যে যেন তাঁর ওপরে নজর রাখছে। তাই হাঁটা শুরু না করে উনি আবার সেদিকে আড়চোখে তাকালেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তবু বার দুয়েক ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে হাঁটা শুরু করতেই মনে হল তাঁর ঠিক পেছনেই কেউ আসছে। ছিনতাইবাজ হতে পারে। তাই মনোহরবাবু সভয়ে ফুটপাতের ঠিক বাঁদিকে সরে গেলেন। আজকাল তো খবরের কাগজে প্রায়ই তিনি পড়েন, ছিনতাইবাজরা নিরীহ লোকদের কাছ থেকে ব্যাগ বা দামি জিনিস কেড়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। পুলিশ তাদের এখনও ধরতে পারে নি। কাজেই সাবধানে থাকা ভালো।

আগে তো ওঁর সবকিছুর দিকে তাকানোর সময়ই ছিল না, আর এখন অবসর নেওয়ার পরে অঢেল সময়। তাই পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখে নিতে হবে। চোর, ডাকাত আর সমাজবিরোধীদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে। আজকে মনোহরবাবুর ব্যাঙ্কে যাবার কথা। তাই উনি সোজা পথে না গিয়ে উলটো পথে হাঁটতে লাগলেন। যদি কেউ ওঁকে ফলো করে থাকে, তাহলেও সে বুঝতে পারবে না যে তিনি টাকা তুলতে এসেছেন।

বাতিকগ্রস্ত হলেও মনোহরবাবু মানুষটা কিন্তু খুব ভালো এবং দয়ালু। গত কুড়ি বছর ধরে উনি একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে জড়িত আছেন। সেখানে উনি পয়সা দান করে থাকেন। এছাড়া কয়েকটা দুঃস্থ বাচ্চার পড়াশোনার খরচও উনি বহন করে থাকেন। এজন্য বাতিক থাকা সত্ত্বেও কেউ ওনাকে কিছু বলেন না। গত বছর স্থানীয় পৌরসভা ওনাকে সম্মানিত করেছে। আজ উনি ব্যাঙ্কে গিয়ে কিছু টাকা তুলবেন সেই টাকা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দেবেন।

যাইহোক, উলটো পথে ব্যাঙ্কে পৌঁছে উনি সাঁ করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন আর তাড়াতাড়ি দশ হাজার টাকা তুলে সেগুলো ভাগ করে ধুতির কোঁচড়ে রেখে 'কিছুই হয় নি' এমন ভাব

করে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। আর কয়েক কদম গিয়েই তাঁর মনে হল, সেই লোকটা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে এদিকেই দেখছে। অর্থাৎ তাঁর অপেক্ষাতেই যেন রয়েছে। মনোহরবাবুর বুক দুরু দুরু করে উঠল। এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও এরা সব জানতে পেরে গেছে। আর তাই উনি লোকটাকে ভালো করে দেখে নিয়ে উলটো পথেই হাঁটতে শুরু করলেন। তার কাছে একটা মোবাইল থাকলে লোকটার একটা ছবি তুলতে পারতেন। লোকটার বয়েস তিরিশের মধ্যেই হবে। গালে চাপ দাড়ি আর গায়ে কালো রংয়ের টি শার্ট, কালো প্যান্ট। লোকটা নির্ঘাত ছিনতাইবাজ বা গুন্ডা। উলটো দিকে কিছুদুর গিয়েই দেখলেন আরো একটা মোটাসোটা লোক তাঁর দিকে আসছে। লোকটার গায়ে কুর্তা আর রংচটা জিন্স। তাঁর কাছে আসতেই সেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা শ্রী মনোহরচন্দ্র সরখেলের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?

এই লোকটার চেহারাও ঠিক গুন্ডাদের মতো। আর এর মুখ থেকে নিজের নাম শুনে তো প্রায় দম আটকে যাচ্ছিল মনোহরবাবুর। উনি পালটা জিজ্ঞেস করলেন, কেন মনোহরবাবুকে কি দরকার ?

তখন লোকটা বলল, আমরা আসলে আমাদের গ্যাং-এর সদস্য। অভিযান ক্লাব ওঁর খোঁজ করছিল।

গ্যাং- এই শব্দটা শুনে তো ওনার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। তার মানে এরা গুন্ডাদের গ্যাং-এর সদস্য। উনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি মনোহর ঘোষের বাড়ি চিনি, তবে সরখেল বলে কোনো লোককে আমি চিনি না, বলে পাশ কাটিয়ে দ্রুত গতিতে চলে গেলেন। আর যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখলেন সেই চাপদাড়ি লোকটা এখন অন্য লোকটার সাথে কথা বলছে। তার মানে এরা দু'জনেই সেই গ্যাং-এর সদস্য। গলিটা পেরোবার ঠিক পরেই উনি একপ্রকার দৌড়াতে শুরু করলেন। থামলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে গিয়ে। বিদ্যালয়ের ঠিক পিছনে এসে চারদিক দেখে উনি বুঝতে পারলেন যে গত সপ্তাহে গিন্নি গয়নাগুলো ব্যাঙ্ক থেকে বাড়িতে এনে রেখেছেন, সেটা গুন্ডারা বুঝতে পেরেছে। ব্যাঙ্কের লোকদের সাথে ওদের যোগসাজশ আছে। আর এই জন্যই গিন্নিকে পই পই করে বলেছিলেন, অত দামি গয়নাগুলো লকার থেকে না আনাতে। কিন্তু গিন্নি কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, ভাইঝির বিয়েতে ওই গয়নাগুলোই আমি পরব। ভাইঝির বিয়ে তো পরের সপ্তাহে, তাই এত তাড়াতাড়ি গয়নাগুলো ব্যাঙ্ক থেকে আনার কি দরকার ছিল। বিয়ের দিন দু'য়েক আগে আনলেই তো হত। কিন্তু নাঃ গিন্নির জেদের কাছে তাঁকে হার মানতে হল। ব্যাঙ্ক থেকে এই গত পরশুই লক্ষ টাকা দামের গয়না বাড়িতে আনা হল। আর এবারে বোঝো ঠ্যালা। ওগুলো যে বাড়িতে আছে, তা চোরেরা বা ডাকাতেরা জানতে পেরে গেছে আর তাই তাঁর বাড়ির খোঁজ করছে।

মনোহরবাবু এবারে আরো বাঁকা পথে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করলেন। ঝোঁপ ঝাড়, নালা, খানা, খন্দ পেরিয়ে অবশেষে বাড়ি পৌঁছে শেকল দিয়ে দরজায় আঘাত করতে লাগলেন। কাজের লোক নরু দরজাটা খুলতেই উনি এক লাফে দোতলায় পৌঁছেই গিন্নিকে চেঁচিয়ে ডাকলেন আর উনি আসতেই সব কথা ফিসফিসিয়ে বললেন। শুনে গিন্নি যেই কিছু বলতে যাবেন অমনি সদর দরজায় করাঘাত। আর সাথে চিৎকার, মনোহরবাবু আছেন নাকি ? একটু দরজাটা খুলবেন, দরকার ছিল। গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারলেন, সেই কুর্তা পরা লোকটাই এসেছে আর সঙ্গে সেই চাপদাড়িটাও আছে। উনি নরুকে বললেন, দরজাটা না খুলতে। লোকদুটো বার কয়েক ডাকতেই পাশের বাড়ির পবিত্রবাবু বেরিয়ে যেন ওদের কিছু বললেন আর তার পরে উনিও মনোহরবাবুর নাম ধরে বার কয়েক ডেকে চলে গেলেন। আর লোকদুটোর কন্ঠস্বর আর শোনা গেল না। গিন্নি বললেন, আমার মনে হয় তোমার কিছু ভুল হচ্ছে। গুন্ডা বদমাশ হলে পাশের বাড়ির লোকের সাথে কথা বলত না। মনোহরবাবু উত্তর দিলেন, ওটা পবিত্রবাবুর গলা নয়, ওঁর গলা নকল করে ওই গুন্ডাগুলো ডাকছিল। যাইহোক, তখন আর কিছু ঘটল না। কিন্তুদুপুর ঠিক বারোটার সময় পিওন এসে দরজায় ধাক্কা দিল আর চিঠি নেবার সময় পাশের বাড়ি থেকে পবিত্রবাবু বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন মশাই ? অভিযান ক্লাব থেকে দুটো ছেলে এসেছিল, ওরা আবার বাংলা ব্যান্ড আমাদের গ্যাং-এরও সদস্য, খুব ভালো গায়। ওরা আপনাকে আগামী সরস্বতী পুজোর দিন সংবর্ধনা দিতে চায়। আর আপনি যে সামাজিক কাজ করেন তার জন্য নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকাও দেবে বলছিল। সেই ছেলে দুটো কতক্ষণ আপনার দরজায় ধাক্কা মারল। শব্দ পেয়ে আমিও এসে আপনাকে কত ডাকলাম কিন্তু সাড়াই পেলাম না। তবে ছেলে দুটো ওদের মোবাইল নাম্বার আমাকে দিয়ে গেছে। আপনি এক্ষুণি ওদের সাথে যোগাযোগ করুন। ভেতরে ঢুকে গিন্নি রেগে গিয়ে বললেন, বেশি সন্দেহবাতিক হলে কি হয়, দেখলে তো ? আজ থেকে নিজেকে বাতিক মুক্ত করো আর ওই ছেলেদুটোর সাথে এক্ষুণি যোগাযোগ কর। বেচারা মনোহরবাবু আর কি করেন, ধীরে ধীরে টেলিফোনটার দিকে এগোলেন। তবে উনি সেই ছেলেগুলোর ওপরে রেগে গেলেন, ওরা নিজেদের ব্যান্ডের আর ভালো নাম পেল না। শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্যাং ? তোমরাই ঠিক কর, মনোহরবাবুর রাগটা ঠিক না ভুল ?

সুচন্দ্রনাথ দাস

বেঁচে থাকার মায়া

হিজল বকুল চারিদিকে, আম-কাঁঠালের ছায়া,
এইখানেতে জীবন জুড়ে বেঁচে থাকার মায়া।

কাছে নদী, দূরে পাহাড়, স্বপ্ন মাখামাখি,
হৃদয় নাচে যখন শুনি পাখির ডাকাডাকি।

খেতে খেতে ফলে কত আমন-আউস ধান,
ছন্দে মধুর বাঁশের বাঁশি, খোল বাজানো গান।

ধনী-গরিব সবাই মিলে প্রতিবেশী জন,
দুঃখ কারও দেখলে চোখে কেঁদে ওঠে মন।

স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে, আবার ভালোবাসা,
দুঃখ দৈন্য ছাপিয়ে জাগে বেঁচে থাকার আশা।

সবার শ্রমে সমাজ গ'ড়ে আমরা বেঁচে থাকি,
সুখে-দুঃখে জন্মভূমি স্বপ্ন মাখামাখি।

গদাধর সরকার

কাঁসাই নদীর ধারে

তুমি আমার শাপলা, কদম
তুমি আমার আলোর বাঁশি এসো শপথ করি
ছড়িয়ে দেবো মেধার পালক
ভাসিয়ে দেবো আশার রঙিন তরী
এই যে হরিণ আকাশ দোলে
আর লেখা দিন 'তারা' ছড়ায় ঘাসে
দেবদারু ময় এই কারুকাজ
দেখতে ভুবন দারুণ-ভালোবাসে।
ঘুমের নেশায় তাই ভেসে যাই
ঢেউ কুড়িয়ে বেড়াই দেশে দেশে
কেউ বা বলে বাউল ঠাকুর
কেউ বা ডাকে মাদল ব'লে এসে।
একটু দ্যাখো দেখতে পাবে
মনতো পাখি বাতাস রুমাল নাড়ে
তুমি আমার শাপলা কদম চলো
দু-জন আবার উড়ি কাঁসাই নদীর ধারে।

পার্থ সিনহা

পঞ্চানন

ভোজবাজি নয়, ভোজবাজি নয়, একেবারে সত্যি —
রাতারাতি পঞ্চাননের বাড়ল প্রতিপত্তি!
কালও ওকে আদর করে ডাকত সবাই – পঞ্চু,
ওইনামে আজ ডাকলে, রাগে মুখ যেন হয় চঞ্চু!
তাপ্পিমারা পাঞ্জাবি আর পরত ছেঁড়া ধুতি
স্যুট-বুটে আজ সাহেব-সাহেব লাগছে অনুভূতি!
ঘুরত আগে দিব্যি হেঁটে হাওয়াই চটি পায়ে
এখন ঘোরে চার-চাকাতে এসেন্স দিয়ে গায়ে!
পান্তা-ভাতই লবন দিয়ে করত চেটে সাবাড়
সেই পাতে আজ কোপ্তা-কাবাব, বাদশাহি সব খাবার।
খড়ো চালের মাটির ঘরই আবাস ছিল তার
আজ সেখানে দালান-কোঠা উঠছে চমৎকার।
কেমন করে ফিরল বরাত ? নানান কথা শুনি,
গুপ্তধনও মিলতে পারে, বলছে জ্ঞানীগুণী!
কেউবা বলে ফিসফিসিয়ে — শুনছি পাঁচুকাকা
দাঁও মেরেছে লটারিতে কয়েক কোটি টাকা!
মুখটি চেপে কে যেন কয় — নেইরে পাঁচু সৎ
অসৎ পথে কামাচ্ছে সব, কি যে ভবিষ্যৎ!
এসব শুনেও হয়না কাতর লোকটা মনো-ব্যথায়
কী এসে যায় পঞ্চাননের, পঞ্চজনের কথায় ?

সমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমরাও পারবে

শহিদমিনারটা ভেঙে কাল রাতেতে
নীল ভাই বসিয়েছে দাদাইয়ের ছাতেতে।
চিড়িয়াখানাটা তুলে নিয়ে এসে কালনায়
জলহস্তিটাকে বেঁধে রাখে জানলায়।
জাদু করে যাদুঘর উড়িয়েছে আকাশ
হাওড়ার ব্রিজটাতে লাগিয়েছে চাকা সে।
ঠেলতে ঠেলতে এনে বসিয়েছে জিরাটে
এপার ওপার হাঁটে নীল ভাই ফি-রাতে।
এত বড় ক্ষমতাটা পেল কোথা নীল ভাই ?
সকালে বিকালে দেখা কার্টুনের জুড়ি নাই।
কার্টুনটা দেখলে তা তোমরাও পারবে
স্বপ্নের কাছে কেন শুধু শুধু হারবে ?

স্মরজিৎ বিশ্বাস

আমার আশা আমার ভাষা

বাংলা আমার মায়ের মুখের ছোট্ট তোতা পাখি
ফুড়ুৎ করে ঠোঁটে বসেই জুড়লো ডাকাডাকি।
নানান পাখি নানান সুরে ঘুরছে উঠোন জুড়ে
হঠাৎ দেখি ভাষার জাহাজ ভাসছে সমুদ্দুরে।

সেই জাহাজে যাচ্ছি ভেসে অন্য আলোর দেশে
পাখির পাখায় তখন দেখি আকাশ ওঠে হেসে।
সূর্য খেলে লুকোচুরি মেঘ-পাহাড়ের কোলে
সবুজ ঘাসে ধীর বাতাসে ভাষার পুঁতি দোলে।

সেই পুঁতিতে মালা গেঁথে ছোট্ট খোকা খুকি
যেই পরেছে ওমনি তখন জোছনা দিল উঁকি।
পার হয়ে যাই 'ক্ষীরের পুতুল' 'ঠাকুমায়ের ঝুলি'
মনের পাতায় দাপিয়ে বেড়ায় একান্ন বুলবুলি।

বাংলা ভাষা আমার আশা প্রাণের আলোকবাণী।
এই ভাষাতে জ্বালাবো ধরায় জ্ঞানের প্রদীপখানি।
ভুবন মাঝে ছড়িয়ে দেব বাংলা মায়ের গাথা
হৃদ-কমলে মাতৃভাষার থাকবে আসন পাতা।

স্নেহাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

তাইতো খুশি সব

প্রজাপতির রঙিন ডানায় মৌমাছিদের গানে,
শিশির ভেজা দুব্‌বো ঘাসে শারদ প্রভাত আনে।
দিঘির জলে শাপলা-শালুক সবুজ ধানের ক্ষেতে,
পুজোর আভাষ পেয়েই সবার উঠছে যে মন মেতে।
হই-হুল্লোড়, চেঁচামেচি এবং কলরব।
দিচ্ছে জানান আসছে পুজো তাইতো খুশি সব।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উলের বাজার

ফকল্যান্ড দ্বীপে মোটে লোক তিন হাজার,
জানো কি তাদের পোষা সংখ্যা ভেড়ার
পাঁচ লাখ ভেড়া সব
করে শুধু ভ্যা ভ্যা রব
ওরাই রেখেছে ধরে উলের বাজার।

সুমিতকুমার বেরা

দুষ্টু

দাদুর ছড়ি, পকেট ঘড়ি চশমা না হয় ছাতা,
বাবার কলম, ব্যথার মলম দিন হিসেবের খাতা।
দিদার চটি, পুজোর ঘটি তুলসি কাঠের মালা,
মা-এর জুতো, সূঁচ আর সুতো গেটের চাবি তালা।
এই ছিল সব হাতের কাছে এক নিমেষেই হাওয়া,
সবাই জানে এসব কিছু কোথায় যাবে পাওয়া।
খুঁজতে হবে কপাট কোণে, খাটের নীচে গিয়ে,
খেলনা ছেড়ে দুষ্টু সোনা খেলছে এসব নিয়ে।

রণজিৎ হালদার

সবাই থাকি কাজে

ঠাম্মা অনেক গল্প বলে দাদু শোনায় গান,
দাদু যখন তামাক টানে ঠাম্মা চিবোয় পান।
মা সারাদিন রান্না ঘরে অনেক কিছুই রাঁধে,
বোনটা ছোট বায়না করে, যখন তখন কাঁদে।
সারাটা দিন বাবা সদাই ব্যস্ত নানা কাজে,
সন্ধ্যাবেলা আমায় ডেকে পড়ায় মাঝে মাঝে।
বাবার সাথে কাকাও থাকে মায়ের সাথে কাকী,
আমরা ছোট ইস্কুলে যাই পড়ায় মেতে থাকি।

তপনকুমার দাস

এই ছেলেটা

এই ছেলেটা ভেলভেলেটা যাবি আমার বাড়ি,
গেলে তোকে দেবো আমি একটি খেলনা গাড়ি।
এই ছেলেটা ভেলভেলেটা দুঃখ কেন রাখিস,
উদাস হয়ে গাছের পাতায় কিসের ছবি আঁকিস।
এই ছেলেটা ভেলভেলেটা বলনা কি তোর নাম,
কোথায় থাকিস, কি তুই করিস কোথায় তোর সেই গ্রাম।
এই ছেলেটা ভেলভেলেটা বন্ধু হবি তুই
চলনা তবে আমরা দু'জন এক বিছানায় শুই।

শুভজিৎ বরকন্দাজ
আমার শরৎ, আমার বাড়ি

এক ফালি এক মাটির দাওয়া
মাথার উপর খড়ের নুচি
রাতের বেলায় চাঁদের আলো
ভোর সকালে হিরের কুচি।

গড়িয়ে নামে সবুজ ঘাসে
টলটলানো শিশিরকণা
জলের রেখায় হাজার বুনন
রোদ্দুরে তার কী আলপনা!

বাগান জুড়ে শিউলি ছড়ায়
নুইয়ে আসে গাছের মাথা
পুকুর পাড়ে বকুল টগর
গন্ধ ছড়ায় লেবুর পাতা।

নীল সাদা রং ছড়িয়ে রাখে
মাথার ওপর মেঘের ভেলা
কাশের মাথা দুলিয়ে হাওয়ায়
শরৎ রানি করেন খেলা।

অশেষকুমার ভট্টাচার্য
যদি

ধব্‌ধবে সাদা কাশ ক্ষেতের ঐ কোলে
পুজো এল বলে তারা কি দারুণ দোলে।
উঠোনের পাশে ঝরে শিউলির হাসি
টুপ্‌টুপ্‌ পড়ে পড়ে জমে রাশি রাশি।
বাতাসেতে ভাসে ঘাণ দূর থেকে দূরে
সেই ঘ্রাণ মিশে যায় আগমনি সুরে।
পুজোতেই দেখি হাসি শত কচিমুখে
মনে হয় সবে মিলে আছে তারা সুখে।
পিঠের ঐ বোঝা থেকে কিছুদিন ছুটি —
বারে বারে প্যান্ডেলে যায় গুটি গুটি।
তবু এ মনটাকে আরো দূরে বাড়ালে
হতাশায় ভরে বুক এ সবের আড়ালে।
বাকিদের দুখটাকে বলি কোন ভাষাতে ?
ভাবি তারা বেঁচে থাকে না জানি কি আশাতে।
শিশুদের সব মুখে দেখি যদি হাসি,
ভাবি তবে বারে বারে আরো ফিরে আসি।

তারক চট্টোপাধ্যায়
সকলের তরে হাসি যেন ঝরে

সকালের রোদ রাঙা হয়ে ওঠে
তারও মুখে হাসি খিলখিল
শিউলি ঝরানো শরতের দিনও
হাসি মাখা মুখে ঝিলমিল।
স্কুল ছুটি হওয়া ছেলেদের দলও
হাসি হাসি মুখে ফেরে ঘর
বর্ষা ফুরানো ঐ নদী বুকে
হেসে ওঠে যেন কাশচর।
কুড়িয়ে কাগজ পথে পথে ঘোরা
ছেলেটি যে আর হাসে না
ফুটপাতে তার রাত কাটে তাই
ঠোঁটে তার হাসি আসে না।
সোচ্চারে তাই বলি একসাথে
আমাদের দাবি একটাই
যত শিশু আছে যেখানে যেথায়
সবাকার মুখে হাসি চাই।

মোহাম্মদ আলী বুলবুল
পুজোর ছুটি

সোনাঝুরির আঁকন বাঁকন
নদীর বুকে ঢেউ
শিউলি শরৎ হাতছানি দেয়
আসছে বুঝি কেউ ?
সাদা মেঘের ওড়না ওড়ে
আবার আকাশ নীল
মিষ্টি হাসি বাজায় বাঁশি
চারদিকে ঝিল্‌মিল্‌।
তাক কুড়াকুড় বাজনা বাজে
আতসবাজির ধুম
পুজোর ছুটি পুজোর ছুটি
চোখেতে নেই ঘুম!

গোপালচন্দ্র মাজি
শরৎ প্রাতে

সোনা রোদ ঝিক মিক
কচি ধান চারা চিক্‌ চিক্‌
শরতের পরশে,
পুজো পুজো গন্ধে
সকাল থেকে সন্ধে
নাচে খুকু হরষে।
নদী কূলে কাশ ফুল
উঠোনে শিউলি বকুল
উঁকি মারে নীলাকাশে।
শরতের পূণ্য প্রাতে
কচি-কাঁচার উল্লাসেতে
আগমনির সুর ভাসে।

স্বপন বসু মল্লিক
এলো শরৎ

শিউলি ফুলে ফুটলো হাসি
শরৎ বুঝি এলো,
আকাশ নীলে মেঘ পরিরা
পুজোর খবর পেলো।
ভ্রমর নাচে পদ্ম-শালুক
ফুলে, আপন মনে।
দোল দোল হিমেল হাওয়া
দোলে কাশের বনে।
প্রজাপতির পাখায় পাখায়
খুশির নেশা লাগে,
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নস্মৃতি
দিনগুলো সব জাগে।

ষষ্ঠীপদ পাল

পুচকুর ব্যস্ততা

পুচকু সোনার একটখানি
সময় হাতে নাই,
খাবারও না, শোবারও না
আজ বলেছে, তাই,
কুড়িখানা পুতুল আমার
আর যে ওদের বায়না,
এতেই যাচ্ছে সকাল দুপুর
ভিন্‌কাজে মন যায়না।

আচ্ছা বলো, কতই বয়েস
পা দেয়েছি পাঁচে,
পুতুল হলেও, তাদেরও তো
সুখ দুঃখ আছে!
তাদেরকে তো দেখতে হবে
মা বোঝেনা তা,
সে বুঝলে আমার এতো
দুঃখ হতো না।

রাজীব মিত্র

আরো দামি

খরিদ্দার বললে রেগে
ওয়েটার কে ডেকে,
"বসে বসে এককাপ চা
চাইলাম সেই থেকে।
এটা আমায় কি দিয়েছো
কেরোসিনের ঝাঁঝ
দামও বেশি এ হোটেলের
কেমন ধারা কাজ ?"

ওয়েটার কয়, "ভুলটা আমার
দিলাম অর্ডিনারী,
চাইলেই স্যার আরো দামি
চা খাওয়াতে পারি।
এককাপ চা তিরিশ টাকা
খেলেই পাবেন টের,
কেরোসিন না গন্ধ সেটার
পাবেন পেট্রোলের।"

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় দাস

সবাই কবে মানুষ হবে

সবাই কবে সহজ হবে ?
সরল হবে সব্‌বাই
চিন্তা কুটিল আঁটবে না
সব দুষ্কর্মে দিক ছাই।

সবার কবে সিধে পথে
পেটের ক্ষিদে পুরবে ?
কবে গরিব-গুর্বো গুলোর
ভাগ্য চাকা ঘুরবে ?

ঠক্‌বে না কেউ আস্থা রেখে
রোগ ব্যধিতে শিক্ষায়,
মিথ্যা বলে দু'দশ টাকা
কেউ চাবে না ভিক্ষায়।

এমন বাড়ি ব্রিজ হবে না
মরার ঝুঁকি থাকবে,
লাভ ক্ষতিটার অঙ্ক করে
সমষ্টি গা'য় মাখবে ?

আখের ছেড়ে আখের মধু
রাখবে সবার জন্য,
নইলে আমরা মানুষ কিসে ?
বেশ তো ছিলাম বন্য।

উড়বে না আর কালো টাকা,
রাজারা হোক শক্ত,
স্বচ্ছ এবং সবাই রাজা
ঝরবে না আর রক্ত।

সবার তরে বিশুদ্ধ শ্বাস
হলেই সহজ লভ্য
বলতে আমরা পারবো তখন
মনুষ্য জাত সভ্য।

শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী

বেস্ট গিফট

আসতে দে বার্থ ডে টা
দেখে নিবি সকলে
কতগুলো ফ্রেন্ড আসে
গিফট কত দখলে।
ক্রিমটপ কেকে হবে
ক্যান্ডেল আট টা,
এক ফুঁয়ে নিভে যাবে
হাততালি ষাট টা।

হ্যাপি বার্থ ডে টু য়্যু
গমগম কোরাসে,
কত পোজ ধরা দেবে
ক্যামেরার ফোকাসে।
বেস্ট গিফট কোনটা ? সে
করো দেখি আন্দাজ
পারলে না বলতে তো
সবার সে নয় কাজ।

বেস্ট গিফট আসে নিয়ে
পুওরেস্ট গৌরব
মা'র রাঁধা এক বাটি
পায়েসের সৌরভ।

সন্তোষকুমার রায় ঠাকুর

মন্দিরেতে মূর্তি থাকে
ঠাকুর তাঁকে ডাকি,
তাঁর চরণে হাজার রকম
মানত করে থাকি।
পূজা-পাঠ করেন যে জন
ঠাকুর মশাই তিনি
রান্না করেন যে জন তাঁকেও
ঠাকুর নামেই চিনি।
ঠাকুর নামে হয় পদবি
নাই বা গেলাম দূর,
সবার প্রিয় বিশ্বকবি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুদীপ্ত বিশ্বাস

বৈজ্ঞানিকের ছড়া

মুরগি হল গ্যালাস গ্যালাস, অ্যানসার অ্যানসার হাঁস
ওরাইজা স্যাটিভা ধান আর বাম্বুসা টুল্‌ডা বাঁশ।
ক্যানিস ফ্যামিলিয়ারিস কুকুর, আমাদের বাড়ি থাকে
মাঝে মাঝেই লেজটি নেড়ে ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ ডাকে।
লেবিও রোহিতা, কাতলা কাতলা এদের পাবে বিলে
ছোঁ মেরে বারবাস পুটিয়াসকে তুলে নেয় চিলে।
টিট্রিকাম এস্টিভাম এর আটায় তৈরি হয় রুটি
বৈজ্ঞানিকের পিসাম স্যাটিভাম, বাংলায় মটর শুঁটি।
বিজ্ঞানীরা রেশম মথকে বলেন বোম্বিক্স মেরি
হেটারোপনিউটিস কাঁটা মারে, সাবধানে তাই ধরি।
বুফোমেলানোস টিকটাস ঘরের কোণে থাকে
বর্ষা কালে আনন্দেতে গ্যাঙর-গ্যাঙর ডাকে।
মৌমাছি মধু চোষে ব্রাসিকা নিগ্রা ফুলে
কোকাস নুসিফেরার তেল আমরা মাখি চুলে।
এপিস ইন্ডিকার মধু ভরিয়ে দেয় প্রাণ
এডিস ইজিপ্ট গান শুনিয়ে রক্ত চুষে খান।
বিকেল বেলা জিয়া মেজ পুড়িয়ে খেতে মজা
বানানো যায় খই, ছাতু আর মিষ্টি গজা।
সেরিয়া রোবাস্টারের খাটে শুতে ভালোবাসি
অসিমাম সাংটামের পাতা সারায় সর্দি কাশি।
যার আছে কিছু মান আর কিছু হুঁশ,
হোমো সেপিয়ান্স তিনি, তিনিই মানুষ।
প্রজাতি দিয়ে শেষ আর গণ দিয়ে শুরু
ক্যারোলাস লিনিয়াস এই নামের গুরু।

পুতুল ভট্টাচার্য

সুন্দর এক স্বদেশ গড়ি

স্বর্গরাজ্য দেবতাদের তাঁদের খবর জানিনা,
মর্তে শুধুই হানাহানি কেউ কাউকে মানিনা।
পাতালেতে উথাল-পাথাল তারও প্রভাব মর্তে,
ঘর দুয়ার সব ধসে গেলে লুকোবো কোন গর্তে ?
যখন তখন ভূমিকম্প বিশ্বজোড়া রেশ তার
আতঙ্কে তাই হয়না ঘুম কি হবে এ দেশটার ?
বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত বেজায় এসো তাঁদের মদত করি,
হানাহানি বন্ধ করে সুন্দর এক স্বদেশ গড়ি।

চৈতালি মজুমদার

ওহায়োর রাস্তায়

অনেক রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে চলে
কয়েকটা তার একলাই চুপ থাকে।
বড় রাস্তায় অনেক গাড়ির ভীড়
ওরা রাস্তাকে খুব বিজি করে রাখে।

সিগন্যালগুলো সবুজ লাল চোখে
এর ফাঁকে ফাঁকে হরিণের যাতায়াত
হঠাৎ তাদের রাস্তায় এসে পড়া
কোন গাড়িটাকে করে দেয় যেন কাত।

এ ওয়ান সিটিতে সবুজের সম্ভার
গ্রাম-শহরের এতটাই মাখামাখি
কোলাহল নেই বেশিটাই নীরবতা
মনে হয় যেন এর কাছাকাছি থাকি।

সুশান্ত তেওয়ারী

ছোটকু

ছটফটে ছোটকু ধবধবে ফরসা,
কখন কি করে ফেলে নেই কোন ভরসা।
টকটকে লাল জামা পরে যায় ইস্কুল
রাস্তার গাছ থেকে পেড়ে খায় জামরুল।
কচকচে কাঁচা আম দিয়ে নুন লঙ্কা,
গিলে খায় জল দিয়ে গোটা পাঁচ টঙ্কা।
গনগনে দুপুরেতে খালি পায়ে ছাদেতে
লাটাই ও ঘুড়ি নিয়ে টান মারে সুতোতে।
কনকনে ঠান্ডায় বসে থাকে ফ্রিজেতে
বরফের গোলা খায় কোলা দিয়ে সিঁড়িতে।
দুমদাম মেরে দেয় রেগে গেলে যাকে পায়,
খুশিতে লাফিয়ে ওঠে আঙুলেতে কামড়ায়।

মদন চক্রবর্তী

ফল

কলা বেল লিচু খাও , খাও পাকা আম
আনারস নাসপাতি খাও পাকা জাম।
আঙুর বেদানা খাও, খাও পাকা কুল
কাঁঠাল সবেদা খাও খাও ফল-মূল।

উই আর দ্য বেস্ট

অমল ত্রিবেদী

দুই হায়দরাবাদি কন্যা, দু'জনেই বিশ্ব খেলাধুলোয় শীর্ষস্থানে। ভারতে এমন রেকর্ড আগে কখনও হয়নি। ২০১৫ সাল ভারতীয় খেলাধুলোয় এক চিরস্মরণীয় বছর। টেনিস ও ব্যাডমিন্টন এই দুই গেমসে ভারতের দুই মেয়ে বিশ্বে এক নম্বর, আমরা আগে কখনও এমন স্বপ্ন দেখার ঔদ্ধত্ব দেখাইনি। সানিয়া মির্জা ও সাইনা নেহওয়াল। প্রথমজন লন টেনিসে মেয়েদের ডাবলসে শীর্ষস্থান পেয়েছে মার্টিনা হিঙ্গিসকে জুটি করে। অন্যদিকে সাইনা মেয়েদের ব্যাডমিন্টন সিঙ্গলসে এক নম্বর হয়েছে। আমরা জানি, বিশ্ব ক্রমপর্যায় তালিকা ঘন ঘন ওঠানামা করে। যেমন সাইনা ইতিমধ্যেই একবার নেমে গিয়ে আবার শীর্ষে উঠে এসেছে। সানিয়া অবশ্য এই লেখার সময় পর্যন্ত শীর্ষস্থানে রয়েছে।

ভারতের এই দুই মেয়ে দুটি পৃথক খেলার খেলোয়াড় হলেও দু'জনেই হায়দরাবাদের কন্যা। খেলার হাতেখড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের এই রজধানি শহরে। যা কিনা একসময় নিজামদের রাজত্ব ছিল। চারমিনারের শহর ২০১৫ সালে দুজন বিশ্বসেরা ক্রীড়াবিদ আমাদের উপহার দিল। দুজনকেই নিয়ে সারা দেশে গর্বের আবহ। খুশি ও আনন্দের বাতাবরণ। দেশের প্রথম মেয়ে খেলোয়াড় হিসেবে এক নম্বর স্থানটি আগে পেয়েছে সাইনা। একমাস পরেই এপ্রিলে সানিয়া।

পর পর ব্যর্থতার জন্য ভেঙে পড়ে ছিল সাইনা। একের পর এক বড় প্রতিযোগিতায় পরাজয় মন ভেঙে দিয়েছিল সাইনার। ব্যর্থতার বোঝা সামলাতে না পেরে গত বছর ব্যাডমিন্টন খেলা থেকে অবসর নেবার কথাও ভেবেছিল ২৪ বছরের মেয়েটি। ছোট থেকে পি গোপিচাঁদের কাছে খেলা শিখেছে। গোপিচাঁদ তাকে ঘষে মেজে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু ২০১৪ সালটি খুবই খারাপ কাটে সাইনার। তখনই সিদ্ধান্ত নেয় কোচ বদলের। বিমল কুমারকে কোচ নিযুক্ত করে হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন শুরু করে। অভিজ্ঞ সাইনা নেহওয়াল এর পরই বাজিমাত করে। অনেক বছরের কোচকে ছেড়ে আসা সহজ কাজ ছিলনা। অনেকে নানান কথাও বলতে থাকেন। ইন্ডিয়া ওপেন সুপার সিরিজে জিতে সে এক নম্বর স্থান পেয়ে যায়। আবার পুরোন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে মেয়ে। নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে।

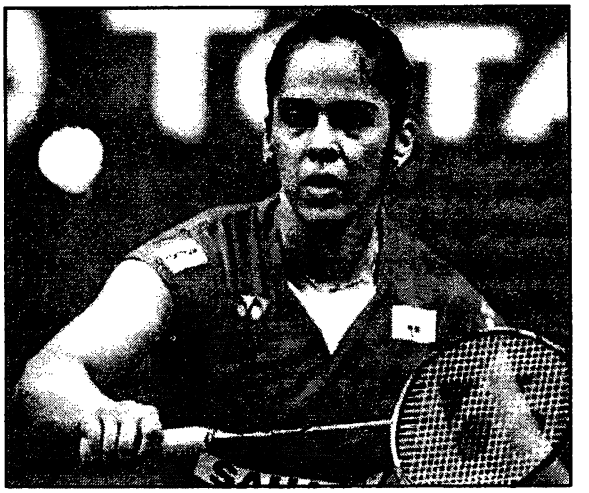

অন্যদিকে সানিয়া মির্জা সিঙ্গলস খেলা ছেড়ে ডাবলস খেলায় মনযোগ দিতেই অবিশ্বাস্য সাফল্য তাকে ঘিরে ধরে। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সুইজারল্যান্ডের মার্টিনা হিঙ্গিসকে জুটি করে সানিয়া টেনিস সার্কিটে টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত ছিল। তার পরই জুটে যায় শীর্ষস্থানটি। মার্টিনা অনেক আগেই খেলা থেকে প্রায় সরে গেছিলেন। তারপর লিয়েন্ডার-হিঙ্গিস মিক্সড ডাবলসে সাফল্য পেয়ে মার্টিনা নতুন করে উদ্বুদ্ধ হন। এরপর মেয়েদের ডাবলসে জুটি বাঁধেন ভারতের সানিয়ার সঙ্গে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য ফিরে পান। ২০০৩ সালে বিশ্ব টেনিস সার্কিটে সানিয়ার পথ চলা শুরু। এ পর্যন্ত ২৬ টি

বিশ্ব টেনিস সংস্থা অনুমোদিত খেতাব জিতেছে। মিক্সড ডাবলসে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন, ইউ এস ওপেন জিতেছে। উইম্বলডন জেতা এখনও বাকি তার। তিন তিনবার অস্ত্রোপচারের পর সানিয়া এখন সম্পূর্ণ ফিট। নিজেকে কঠোর পরিশ্রম, অনুশীলন, স্বার্থত্যাগ, নিবিড় প্রচেষ্টায় গড়ে পিটে এই জায়গায়। গত দু'বছরে তিন নম্বর গ্র্যান্ডস্লাম খেতাব সহ মোট ১১ টি ডবলিউ টি এ খেতাব জিতে এক নম্বরে। এখন স্বপ্ন উইম্বলডন সহ ২০১৬-র রিও অলিম্পিকের সোনা। ব্যাডমিন্টনে সাইনার পর টেনিসের সানিয়া। ভারতের খেলাধুলোয় এমন সোনালি দিন আগে এভাবে দেখা দেয়নি। ভারতবাসী হিসেবে আমরা সবাই গর্বিত দুই হায়দরাবাদি কন্যার জন্য।

গবুর কাণ্ড

কুমার হোড় চৌধুরী

পুরাণের গল্প

ব্যাধ ও হরিণের দল

দেবদুলাল কুন্ডু

এক ব্যাধ শিকারের আশায় বনে বনে ঘুরে নিরাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ক্লান্ত হয়ে ব্যাধ একটা জলাশয়ের ধারে একটা গাছের উপর বসে বিশ্রাম করতে লাগল। সন্ধের পর প্রথম প্রহরে এক হরিণী এল জলাশয়ে জল খেতে। হরিণীকে দেখে ব্যাধের মনে আশার সঞ্চার ঘটল - যাক, অবশেষে একটা শিকার মিলল। ব্যাধ ধনুকে শর যোজনা করে হরিণীকে যেই তাক করেছে, অমনি দূর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে ব্যাধকে দেখে নিয়ে হরিণী বলল, হে ব্যাধ আমাকে মেরোনা।

হরিণীর মুখে মানুষের কথা শুনে ব্যাধ অবাক হয়ে বলল, আমার পরিবারের সকলে আজ দু'দিন অভুক্ত রয়েছে, তোকে মারলে তবেই আহার জুটবে।

—আমার মাংসে তোমাদের আহার জুটবে, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার ঘরে নিজের একটা বোন, আমার স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা আছে। ওদের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করেই ফিরে আসব। হরিণী বলল।

—বিপদে পড়লে সকলেই এরকম কথা বলে । আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ব্যাধ বলল।

— আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কাছে পুনরায় আসব। এখন বিশ্বাস করা, না করা তোমার ব্যাপার। হরিণী বলল।

হরিণীর কথা শুনে বিশ্বাস জন্মাল ব্যাধের। তাছাড়া মানুষের মত যে হরিণী কথা বলে, তার কথা একবার বিশ্বাস করেই দেখা যাক না কি হয়। সে বলল, তুই ঘরে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করেই চলে আসবি।

হরিণী জল খেয়ে ফিরে যাবার কিছুক্ষণ পর আর একটা হরিণী এল সেখানে। তাকে দেখে ব্যাধের আনন্দ আর ধরে না। ব্যাধ তার দিকে ধনুর্বান তুলল দেখে হরিণী কাতর স্বরে বলল, ব্যাধ ভায়া আমাকে মেরোনা। আমার ভগিনী এদিকে জল খেতে এসেছিল। আমি তারই খোঁজে এসেছি। বাড়িতে ওর স্বামী আর বাচ্চারা রয়েছে।

—কিন্তু আমার পরিবারে সকলেই না খেয়ে রয়েছে। ওদের মুখেও তো আহার তুলে দিতে হবে আমাকে। তাই তোকেই আমার দরকার।

—এযে আমার পরম সৌভাগ্য, আমি একজন তুচ্ছ হরিণী, আমার মাংসে তোমার পরিবারে আহার জুটবে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ছুটি দিতে হবে ভাই। কথা দিচ্ছি, ওদের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব। হরিণী বলল।

—দেখ, একটু আগে তোর মতই একজন ফিরে আসবে বলে কথা দিয়ে পালিয়েছে।

—সে মনে হয় আমার দিদি। দোহাই ব্যাধ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি একবার দিদি-জামাইবাবু এবং বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব তোমার কাছে। তখন না হয় মেরো। অগত্যা ব্যাধ আর কি করে, তাকেও যেতে দিল।

দ্বিতীয় হরিণী চলে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরে একটা হরিণ এল জলাশয়ের কাছে। এবারও ব্যাধ হরিণের দিকে তির তাক করল। তাই দেখে কাতর স্বরে হরিণ বলল, ব্যাধ ভায়া আমি আমার স্ত্রী ও তার বোনকে খুঁজতে বেরিয়েছি। বাড়িতে আমার ছেলেমেয়েরা একা রয়েছে।

—এসব গল্প দুবার শোনা হয়ে গেছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

—একটু ধৈর্য্য ধর। আমি কথা দিচ্ছি, ওদের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসব। ব্যাধ ভাবল আগের দু'জনকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তখন একেও ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক না কি ঘটে।

বাসায় একে একে হরিণী, তার বোন এবং হরিণ ফিরে এসেছে। তার ভীত সন্ত্রস্ত মুখে আশু সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা শুরু করল।

প্রথমা হরিণী বলল, হে স্বামী আপনি পরিবারের কর্তা। আপনি চলে গেলে আমার সন্তানেরা পিতার আদর থেকে বঞ্চিত হবে। আমি ব্যাধের কাছে যাচ্ছি, আপনি আর ভগিনী মিলে বাচ্চাদের বড় করে তুলুন। না দিদি, তা হয়না। বাবা মা দুজনকেই ওদের দরকার। বরং আমিই যাচ্ছি ব্যাধের কাছে।

তোমরা বাচ্চাদের নিয়ে সংসার কর। দ্বিতীয় হরিণী বলল।
—তোমরা মায়ের জাত। তোমাদের মমতা ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। আমাকে ছাড়াও তোমার বাচ্চারা বড় হতে পারবে। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। হরিণ বলল।
অবশেষে তিনজন আলোচনা করে ঠিক করল তিনজনেই যাবে। কারণ তিনজনেই ব্যাধের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা বাচ্চাদের শেষ বারের মত আদর করে সাশ্রুনয়নে বিদায় নিল। কিন্তু হরিণ-শাবকেরাও বড়দের অনুসরণ করে ব্যাধের কাছে এল।
অপেক্ষা করতে করতে ব্যাধের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতে বসেছিল। হঠাৎ ব্যাধ দেখল হরিণের গোটা একটা পরিবার তার কাছে আসছে। আ! জিভে যেন জল টল টল করে উঠল।
—ব্যাধ ভায়া আমরা প্রত্যেকেই তোমার কাছে এসেছি। প্রথম হরিণী বলল।
—আমরা তিনজনেই তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় হরিণী বলল।

—আমরা ঠিক করেছি সবাই একসঙ্গে মরব। হরিণ বলল।
—তোমাদের ন্যায় পরায়ণতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তোমাদের শাবকদের তো আমি মারতে চাইনি। ব্যাধ বলল।
—মা-মাসি-বাবাকে ছাড়া আমরা বাঁচব কী করে ? তুমি বরং আমাদেরও হত্যা কর। হরিণ শাবকেরা বলল।
শাবকদের কথা শুনে ব্যাধের মনে বড় দয়া হল। সে বলল, আমারও একটা পরিবার আছে। আমিও জানি স্নেহ-মায়া-মমতা কি জিনিস। তোমাদের কাউকে বধ করে আমি সুখি হতে পারব না। তোমরা মুক্ত, তোমরা সানন্দে ফিরে যাও নিজের বাসায়! আমি বরং অন্য শিকারের খোঁজ করি।

কেন্নোর পদযাত্রা

তাপস চক্রবর্তী

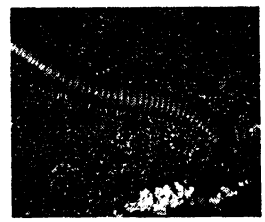

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে বহু ছোট ছোট পোকা-মাকড়ের জন্ম হয় বর্ষাকালে। সারা বছর তাদের দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ষার শুরুতেই তারা এসে হাজির হয়। সেরকমই একটা হল কেন্নো। অনেকগুলো সরু সরু সুতোর মতো পা নিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে বেড়ায় এরা। কেন্নো বড়ই শান্ত। কেন্নোদের বিষও নেই। অল্প একটু ছোঁয়া পেলেই এরা গুটিয়ে গোল হয়ে যায়। এরা দল বেঁধে থাকে।

একদিন অনেক রাত্রে আমার খাওয়া হয়ে যাবার পর লক্ষ্য করলাম একটা কেন্নো আমার খাবার থালার পাশ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টা খানেক পরে একবার ঘরটাকে পাক দিয়ে আবার সেই রাস্তা দিয়ে বাইরে চলে গেল। পরের দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এরপর পড়ার টেবিলে বসে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম কেন্নোটা একই সময় একই রাস্তা ধরে আমার ঘরটাকে একবার পাক খেয়ে তার খাবার সংগ্রহ করে আবার ফিরে যাচ্ছে। এতেই আমার কেন্নোদের বিষয়ে কৌতুহল বেড়ে গেল। আমি কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করে তোমাদের দিলাম। তোমরা পড়ে দেখো।

কেন্নোদের নাম সহস্রপদী হলেও মূলতঃ এদের ৭৫০ টির বেশি পা নেই। কেন্নোদের শরীরটা গোল। কেন্নোর প্রথম কয়েকটি ছাড়া প্রতিটি দেহভাগে দুইজোড়া পা আছে। এই সন্ধিপদের ইংরেজি নাম millipede.

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এক যে ছিল

এক যে ছিল ছেলে
খেলে
চলতো সে বল পেলে।
জেলে
ঠেলতো ঘানি, চোখ থেকে জল ফেলে।
আর ছাড়ান পেলেই বাইরে এলেই উড়ত ডানা মেলে।
এক যে ছিল মেয়ে
ধেয়ে
চলতো নেচে-গেয়ে
খেয়ে।
ডিগবাজি সে মজাই যেত পেয়ে।
আর উলটে কোথায় পড়বে যে হায় দেখতো না তো চেয়ে।
এক ছিল থুত্থুড়ো
বুড়ো
উঠত পাহাড় চূড়ো।
গুঁড়ো
করেই খেত পাবদা মাছের মুড়ো।
আর ডাইরিতে সে লিখত বসে তথ্য এসব গূঢ়।
আর ছিল এক বুড়ি-
থুড়ি,
বয়েস ছিল কুড়ি।
জুড়ি
ছিলই না তার, পরত হাতে চুড়ি।
আর ঘুমের ঘোরে গামলা ভ'রে খেত বাদাম-মুড়ি।

জগদীশচন্দ্র সরখেল

এলো সুখের দিন

কান্নার পর হাসি—
বর্ষার পর শরৎ এল শিউলি রাশি রাশি।
দুঃখের পর সুখ—
স্নিগ্ধ-সতেজ শস্য দানায় ভরা মাঠের বুক।
আঁধারের পর আলো—
সোনা রোদে মাঠ-ঘাট-বন করছে ঝলোমলো।
রাত্রির পর দিন—
আগমনির মধুর সুরে ভ্রমর বাজায় বীণ।

মানস সরকার

গাইবো পুজোর গান

শরৎ এলে শিউলি হাসে আমার সুবজ গাঁয়ে,
ইচ্ছে করে পাখির মতো হারাই গাছের ছায়ে,
মেঘের দেশে পাখির মতো পাখনা মেলে উড়ি
বাতাস মেখে ভোর আকাশে উদাস মনে ঘুরি।
ইচ্ছা করে অনেক কিছু শরৎ সকাল এলে
কাটিয়ে দিতে ঘাসের ডগায় মুক্তো মানিক খেলে।
সূর্য দেবের সাতটি ঘোড়া তাক ধিনা ধিন্ ধিন্
গাছের মাথায় স্থলপদ্ম ফুটবে ক'টা দিন।
শরৎ এলে হাসির ঝিলিক যায় যে ভরে প্রাণ
চল পানসি বঙ্গদেশে গাইবো পুজোর গান।

গোবিন্দ মোদক

ময়ূরপঙ্খী নাও

ও মাঝি ভাই এই অবেলায় কোথায় তুমি যাও
নীল সায়রের ফটিক জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাও!
যাচ্ছ বুঝি সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার
তাইতে বুঝি বাইছো তুমি ছপ্ ছপা ছপ্ দাঁড় ?
ও মাঝিভাই নেবে আমায় যাবো তোমার সাথে
তোমার সাথে দাঁড় বাইবো ছোট্ট দু'টি হাতে।
বাইতে বাইতে পৌঁছে যাবো রূপকথাটার দেশ
সেখানে সব পরি রানির রামধনু রং বেশ।
দাঁড়ে বসে সোনার টিয়া হিরের হিরামন।
যা ইচ্ছা করতে পারে মন চাইবে যখন।
সোনারুপোর তারা জ্বলে রূপকথারই দেশে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমিরা গল্প বলবে এসে।
রূপকথারই গল্প শুনে ঘুমিয়ে যাবো রাতে
পরি দিদি একটি চিঠি দিয়ে যাবে হাতে।
সেই চিঠিতে থাকবে লেখা ওগো মাঝি ভাই
তোমার ময়ূর পঙ্খী নাওয়ের তুলনা কোথাও নাই!

দুর্গাদাস পাল
হাতে-নাতে

পত্রিকা দপ্তরে ঢুকেই
বলে কবি এক সদ্য,
রচনা এক করেছি আমি,
গল্প নয় কো পদ্য।
যদি বলেন শোনাই পড়ে
ছেপে দেবেন কখনো পরে
রোজ রোজ হয় না এমন
এসেছে সুযোগ অদ্য।
ঠিক তখনই দরজা ঠেলে
সম্পাদকটি ঢুকলেন
লেখাটিতে চোখ বুলিয়ে
টেবিলে কলম ঠুকলেন।
বলেন তিনি মুচকি হেসে
আপনি মশাই গ্যাছেন ফেঁসে।
এটা আমরা আগেই ছেপেছি
কোথার থেকে টুকলেন ?

প্রদীপকুমার সামন্ত
সবুজ সাথি

সোঁদরবনের মানুষ আমরা
গাছ-গাছালির সাথি,
সবুজ ছায়ায় প্রাণের মায়ায়
দিন কেটে হয় রাতি।
জলে কুমির ডাঙায় বাঘ
তাদের সাথেই দস্তি,
মাছ আর কাছের সাথে
চিরকাল করি মস্তি।
সুন্দরি গরান হেতালের বনে
মিষ্টি মধুর হাওয়া
মহুয়ারই গন্ধে ভরে
জনমে সুখ পাওয়া।
ফুল-পাখিরা সৃষ্টি করে
মধুর পরিবেশ,
সুনামির এই জলের প্লাবন
জীবনকে করে শেষ।

অপর্ণা দেওঘরিয়া
আয়রে তোকে...

উদাস করা রঙিন দুপুর
স্বপ্ন নিয়ে আয়,
ফুলের সাথে সৃষ্টি নিয়ে
বৃষ্টি নিয়ে আয়।
মামার বাড়ির মন্ডা মিঠাই
বুড়ি পুকুরের মাছ,
স্বপ্নে আঁকা ছবির মত
বুড়ো বটের গাছ।
মন্ত্র দিলে পড়ে যেত
ফুল বাগানের ফুল
ঘুমিয়ে বুড়ি একটু গেলেই
পড়ত গাছের কুল।
স্বপ্ন নিয়ে আয়রে তোরা
কচিকাঁচার বনে
শিউলি ফুলে আলো ছড়িয়ে
হাসছে খুকুর মনে।

জ্যোৎস্না হালদার
খোকার ভাবনা

খোকা ভাবে চলে যাবে
মেঘ পরির দেশে
মেঘের ভেলা চড়ে সে
চলবে হেসে হেসে।
দৈত্যপুরি আসবে ঘুরি
হাতে তলোয়ার
কাটবে মাথা দুষ্টু দৈত্যের
সামনে পাবে যার।
পরির মতো যদি তার
থাকত দুটি ডানা,
চলে যেত চাঁদের দেশে
শুনতো না সে মানা।
যদি পেত পক্ষীরাজ
উড়ে চলা ঘোড়া
দেখত তবে জগতকে সে
থামতো নাকো ঘোরা।

মানস দরিপা
ছড়ার খাতির

ছড়াপাঠে ঘোড়া হাসে তাইতো ছড়ার খাতির,
সানাই শুনে নাচন-কোদন দাদু এবং নাতির।
ছড়ার বাজার অনেক গরম ক'জন রাখে খোঁজ
বিবাহ আর জন্মদিনে মেনুর খাবার, ভোজ।
গ্রাম বাংলার খবর করাটাই লোকগীতির প্রথা
বই-এর ফ্রেমে ছাপা থাকে মনীষীদের কথা।
ছড়ার যে সুর শ্রুতিমধুর মনেতে দেয় দোলা,
বর্ষারাতে ব্যাঙের যে ডাক যায় না আজো ভোলা।
উচ্ছে-বেগুন-পটল-মুলো শাক সবজির ছড়া
সুখ দুঃখের শত কাহিনি ছড়াতে ভাই গড়া।
একাল সেকাল কবির লেখায় নানা স্বাদ বিলকুল
মন্ডা মিঠাই তেতো লাগে নয়কো আদৌ ভুল।
সুস্থ সমাজ গড়ার জন্য ছড়ায় মোড়া চাই
নিত্য নতুন ছড়া তৈরি ছড়ার পিপাসা তাই।

অখিল চট্টোপাধ্যায়
বাবুই আর হনু

সকাল থেকে শুরু হয়েছে টাপুর টুপুর বৃষ্টি
আকাশ ভাঙা মেঘ করেছে একী অনাসৃষ্টি।
জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখি পলক নাহি পড়ে,
পাশের ছাদে হনুর দল ভিজছে অঝোর ঝরে।
গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে একদম চুপচাপ,
পাতার গায়ে জলের শব্দ টুপুর টুপুর টাপ।
বাসার থেকে বাবুই পাখি হনুমানদের বলে
হাত পা আছে বাসা বানাও ভিজবে না কো জলে।
আমরা দেখো ঠোঁট দিয়েই বানিয়েছি ঘর খাসা।
বৃষ্টি-ঝড়ে হবেনা কিছু এই আমাদের আশা।
হনুরা সব রেগে বলে - একটুখানি দাঁড়া
বৃষ্টি থামুক, করছি তোদের কেমন বাসা ছাড়া।
একটু পরেই হনুর দল ভাঙলো যতেক বাসা,
ফেলল ছুড়ে গাছের নীচে মিটিয়ে মনের আশা।
বাবুই বলে, হনু তোরা বদমাইশের ধাড়ি,
গায়ের জোরে করিস তোরা অনেক বাড়াবাড়ি।
এজন্যই লোকে তোদের ধূর্ত বাঁদর বলে
এই না বলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল চলে।

উপমন্যু ও আরুণির উপাখ্যান

শীলা সরকার

মহাভারত চিরস্মরণীয় অমৃত-কাব্য। এই মহাগ্রন্থে যা আছে তা অন্যত্র থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এতে যা নেই, তা আর কোথাও দেখা যাবে না। তাই মহাভারতকে বলা যায় ভারতের অমৃত আত্মা। সেই প্রাচীন জাতীয় জীবনের রূপময় সত্তা। চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন। মহাভারত শুধু কাব্য নয়, বিশ্বকোষও।

এই চরিস্মরণীয় অমৃতকাব্য আজ ও বাঙালি পাঠকের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে বাংলার কবি কাশীরাম দাস সংস্কৃতে শব্দভান্ডার মুক্ত করে তাকে বাংলায় অনুবাদ করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। বর্তমানে দুঃখ একটাই, পূর্বে এই পূণ্য কাহিনি ঘরে ঘরে নিত্য পাঠ হত। ঠাকুরদা, ঠাকুরমারা ও তাদের নাতি নাতনিদের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক, রূপকথার গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করে রাখত। সে যুগ হয়েছে বাসি — তবুও আদি পর্ব থেকে দুটি গল্প শোনাতে চাই বর্তমানের শিশু কিশোরদের।

অবন্তীনগরে সন্দীপন নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর একটি আশ্রম ছিল। সেখানে আশ্রমে অনেক শিষ্য থাকত। তখনকার দিনে পড়াশোনার জন্য এখনকার মত পাঠশালা বা বিদ্যালয় ছিলনা। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে বাস করত। গুরুর আদেশ পালন করাই ছিল শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। প্রাচীনকালে শিক্ষকই ছিলেন গুরু বা আচার্য আর ছাত্রদের বলা হত শিষ্য। মহর্ষি সন্দীপনের এক শিষ্যের নাম ছিল উপমন্যু। অন্যজনের নাম ছিল আরুণি। গুরু এক এক শিষ্যকে এক এক কাজের জন্য পাঠাতেন।

একদিন শিষ্য উপমন্যুকে গোচারণের ভার দিলেন। উপমন্যু আনন্দের সঙ্গে গরু চরাতে লাগল। রোজ সকালে গরু নিয়ে বনে যায় আর সন্ধ্যা নামলে আশ্রমে ফিরে আসে। আচার্য কিছুদিন পরে লক্ষ্য করে দেখলেন, উপমন্যুর শরীর বেশ মোটা সোটা হয়েছে। তিনি অবাক হলেন। উপমন্যুকে ডেকে বললেন, বৎস তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরু নিয়ে বনে জঙ্গলে থাকো, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করতে পারো না। এতে তো তোমার শরীর রোগা ও দুর্বল হওয়ার কথা। কিন্তু আমি দেখছি, তোমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হয়েছে। কারণ কি ? উত্তরে শিষ্য উপমন্যু বলল, গরুগুলিকে বনে চরতে দিয়ে আমি গ্রামে যাই। সেখানে গিয়ে আমি ভিক্ষা করি, তা দিয়েই আমার ক্ষুধা মেটাই।

আচার্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তোমাকে আমি গোচারণ করতে বলেছি। কিন্তু ভিক্ষা করতে তো বলিনি। তাছাড়া কোন কাজই আমাকে না জানিয়ে তোমার করা ঠিক নয়। এখন থেকে যা-ই ভিক্ষা করবে তা সব আমার কাছে নিয়ে আসবে। উপমন্যু গুরুদেবকে প্রণাম করে বলল, বেশ, তাই নিয়ে আসব।

কিছুদিন পর আবার আচার্য লক্ষ্য করলেন, উপমন্যুর শরীর কিছুমাত্র খারপ হয়নি বরং আরো ভালো হয়েছে। তিনি আবার উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ভিক্ষা করে যা যা পাও তা সব আমাকে দিতে বলেছি। তা ঠিক ঠিক দিচ্ছো তো ?

শিষ্য বলল, হ্যাঁ গুরুদেব দিচ্ছি। আচার্য সন্দীপন প্রশ্ন করলেন, তাহলে তোমার শরীর এত ভালো হচ্ছে কি করে ? এবার উপমন্যু জবাবে বলল, আমি সকালে পল্লীতে গিয়ে যা ভিক্ষা পাই সবই আশ্রমে দিয়ে দি। তারপর বিকালে আরো একবার ভিক্ষা করি এবং যা পাই নিজে খাই।

গুরুদেব বললেন, বৎস, ভিক্ষা করা কাজটা ভাল নয়। তারপর যদি তুমি দু'বার ভিক্ষা কর, তবে যারা ভিখারি, তাদের তো খুব ক্ষতি হয়। এছাড়া তোমার এই লোভও দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। এ অভ্যাস তুমি ত্যাগ করো। উপমন্যু আচার্যকে প্রণাম করে বলল, বেশ ত্যাগ করব।

আবার কিছুদিন পরে আচার্য লক্ষ্য করলেন, উপমন্যু বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। খুবই বিস্মিত হয়ে তিনি শিষ্যকে ডেকে বললেন, তুমি কি এখনও ভিক্ষাই করছ। উত্তরে উপমন্যু বলল- না প্রভু। আপনি তো নিষেধ করেছেন। আচার্য বললেন, তাহলে তুমি মোটা হচ্ছ কি করে ?

উপমন্যু বলল, যখন বনে বনে ঘুরে খুব ক্ষিদে পায়, তখন গরু দুইয়ে খানিকটা দুধ খেয়ে নি। তাতেই ক্ষিদে মেটে। গুরুদেব বললেন, তোমাকে শুধু গোচারণ করতে বলেছি। দুধ খাওয়ার হুকুম দিইনি। আমি যতটুকু বলব ততটুকুই তোমার করা উচিত। অতএব আর দুধ খাবেনা।

আরো কিছুদিন কাটল। আচার্য দেখলেন শিষ্য উপমন্যুর দেহ শুকায়নি। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি গরুর দুধ খাচ্ছো ?

উপমন্যু বলল, না গুরুদেব। তবে বাছুর গুলো দুধ খেয়ে গেলে যে ফেণা ওঠে, আমি সেই ফেণা খেয়ে থাকি। আচার্য বললেন, এটাও তুমি ঠিক করছো না। বাছুরগুলি তোমাকে ভালবাসে তাই বেশি করে ফেণা তোমার জন্য রেখে দেয়, এটা আর করবে না।

কিছুদিন পরের কথা। একদিন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অথচ তখনও উপমন্যু আশ্রমে ফেরেনি। ক্রমে রাত্রি হল। গুরুদেব চিন্তিত হয়ে শিষ্যদের নিয়ে খুঁজতে বের হলেন। বনে গিয়ে তারা চিৎকার করে ডাকতে লাগল। দূর থেকে একটা খুব ক্ষীণ উত্তর এল। সেই শব্দকে অনুসরণ করে তারা এক কুঁয়োর কাছে এসে হাজির হল। আচার্য ডাকলেন, উপমন্যু তুমি কোথায় ? জবাব এল, এই যে প্রভু কুঁয়োর মধ্যে। কুঁয়োর মধ্যে পড়লে কেমন করে ?

উপমন্যু বলল, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আকন্দের পাতা খেয়ে ফেলেছিলাম। তাতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় হাঁটতে গিয়ে কুঁয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। আচার্য বললেন, তুমি দেবতাদের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের স্তব কর। তাঁরা তোমার চক্ষু ভাল করে দেবেন।

গুরুর নির্দেশমতো স্তব করায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপমন্যুকে একটি ওষুধ দিয়ে খেতে বললেন। কিন্তু উপমন্যু খেতে রাজি হলনা । বলল , আচার্যের নির্দেশ না পেলে আর তাঁর প্রসাদ না পেলে কিছুই খেতে পারবনা। দেব বৈদ্যরা উপমন্যুর গুরুভক্তি দেখে উপমন্যুর চোখ ভাল করে দিয়ে গেলেন। আচার্য সন্দীপন তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি সমগ্র বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে সুপন্ডিত হও।

গুরু সন্দীপনের আর এক শিষ্য আরুণি। মহাভারতের আদিপর্বের এই গল্পগুলি থেকে জানা যায় সেই যুগের ছাত্র বা শিষ্যদের গুরুভক্তি কেমন ছিল। গুরু বাক্যই ছিল বেদবাক্য। গুরুর আশ্রমই ছিল শিক্ষালয়। রাজপুত্র, ঋষিপুত্র সকলকেই গুরুকূলে বিদ্যারম্ভ করতে হত।

একদিন গুরুদেব আরুণিকে ডেকে আদেশ করলেন, ধানের ক্ষেত থেকে জল দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে। যাও আলে বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করে এসো। আরুণি সেখানে গিয়ে বহু চেষ্টা করেও ক্ষেত থেকে জল বেরিয়ে যাওয়া আটকাতে পারল না। বার বার চেষ্টা করে সফল না হয়ে সে এবার নিজেই আলের উপর শুয়ে পড়ে জল বন্ধ করল। এদিকে সন্ধ্যা হয় এল। আরুণির দেখা নেই। গুরুদেব রাত্রিবেলায় চললেন আরুণির খোঁজে। গিয়ে দেখলেন শিষ্য ক্ষেতের জল আটকাতে মাটিতে শুয়ে আছে। গুরুদেবর নির্দেশে আরুণি উঠে এসে আচার্যকে প্রণাম করলেন। আচার্য সন্তুষ্ট চিত্তে বললেন, আজ থেকে তোমার নাম দিলাম - উদ্দালক। গুরুদেব আশীর্বাদ করে বললেন, চার বেদ আর ছ'টি শাস্ত্রে তোমার জ্ঞান লাভ হোক।

কাজল দাস্

বন্ধু

আকাশ বলল, কেমন আছো, বন্ধু হবে নাকি ?
আমি বললাম গাঁয়ের ছেলে পাড়া গাঁয়েই থাকি।
মুচকি হেসে বলল আকাশ, কি হয়েছে তাতে
বন্ধু তুমি হলে আমার হাত রেখো এই হাতে।
বতাস বলল, লাজুক ছেলে হবে আমার মিতে
মিতে হলেও তোমায় কিছু পারবো না তো দিতে।
বন্ধু হলে তুমি শুধু বন্ধুত্টুকু দিও
পারলে একটি গাছ লাগিও - ওটাই আমার প্রিয়।
তাই শুনে ফুল বলল, হবে আমার সখা ?
আমি তো খুব লাজুক ছেলে আর ভীষণই বোকা।
তাতে আমার কি হয়েছে সখা তুমি আজই
ঠিকই আছে সখাই হলাম, হলাম আমি রাজি।
শোনার পরে মুখ লুকিয়ে বলল হেসে নদী
তোমায় দেব খুশির পরশ সঙ্গে থাকো যদি।
ভরিয়ে দেব জীবন তোমার হাতটি আমার ছুলে
কাছে এলেই বাসবো ভালো, বসতে দেব কোলে।
আকাশ বাতাস ফুল নদী ভাই সবাই আমার মিতে
ওরা শুধু দিতেই জানে চায় না কিছু নিতে।
তাইতো ওরা বন্ধু আমার এবং খুবই প্রিয়,
বন্ধু তুমি একটু ওদের বন্ধু ভেবে নিও।

পরিমল ঘোষ

হাসির হুল্লোড়

পার্কের কোণে রোজ বিকেলে বসে খুশির মেলা,
জোয়ান-বুড়ো সবাই মিলে করে হাসির খেলা।
হা-হা হাসি, হো-হো হাসি আরো আছে নানা,
প্রাণ খুলে হাসতে কারোর নেইতো কোন মানা।
উৎসাহে কেউ হাত-পা ছোড়ে কেউ বা ওঠে নেচে,
হাসি নিয়ে আছে এরা — আছে দারুণ বেঁচে।
হাসির শব্দ যায় ভেসে কাছে এবং দূরে,
গাছের পাখি ভয়ে ভয়ে বসে উড়ে উড়ে।
হাসি শুনে লোক জমে পার্কটার কোণে,
রঙ্গ দেখে তারাও দেখি হাসে মনে মনে।
হাসির তোড়ে দুঃখ ভুলে মানুষ শান্তি পায়,
হাসি যেন নিচ্ছে হেসে রোগমুক্তির দায়।

আমিও পারি

মনোরঞ্জন গরাই

বর্ষা শুরু হতেই মেঘবালিকাগুলি যেন সমস্ত প্রকৃতিকে বৃষ্টিতে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। অবিরাম, অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বৃষ্টির যেন বিরাম নেই।

নির্ঝর বাড়িতে বসে ভগবানকে ডাকতে লাগল যেন কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থেমে যায়। কিন্তু একঘন্টা ধরে প্রার্থনাই সার হল, বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণই নেই।

নির্ঝরের মা হঠাৎকরে একটা এক্সিডেন্টে মারা যাবার পর থেকে গত দু'বছর ধরে ও এখানে অর্থাৎ মামাবাড়িতেই আছে। ও ফাইভে পড়ছে এ গ্রামেরই একটা অনামী স্কুলে।

নির্ঝরের মাঝে মধ্যে মা'র কথা মনে পড়ে। মাঝে মধ্যে স্বপ্নে মা-এর হাসি আর কথাবার্তা শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে। তারপরই তার মনে হয় - ইস স্বপ্নটা যদি সত্যি হয়ে যেত ?

নির্ঝরের বাবা নির্ঝরকে খুব ভালোবাসেন। তিনি চাকরির জন্য এখানে থাকতে পারেন না, তবে প্রতি বরিবার গ্রামে আসেন এবং নির্ঝরের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসেন।

নির্ঝরদের মামাবাড়ি আযোধ্যা পাহাড়ের ঠিক পাদদেশে ডাভা গ্রামে। ওর মামা একজন বড় চাষি। নির্ঝর জানে ওর বাবা ওর জন্য মামাকে অনেক টাকা পয়সা দেন বলেই মামা-মামিমা নির্ঝরকে ভালোবাসেন। কিন্তু ও এত বোকা নয় যে সত্যিকারের আর ছদ্ম ভালোবাসার তফাৎ বুঝতে পারবে না।

মামা ওকে স্কুলে পাঠালেও মামিমা কৌশলে ওকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেন। কাজ করতে তার ভালোই লাগে তবে কিনা যখন ওর মামিমা পোকার ডিমভর্তি চালের ফ্যানভাত আর নামমাত্র তরকারি খেতে দেয় তখন ওর মা-র কথা ভীষণ ভীষণ মনে পড়ে।

(২)

পুরো বর্ষাকাল জুড়ে এখানকার গ্রামগুলিতে তরি-তরকারির অভাব থাকে না বললেই চলে। নির্ঝর আর ওর সঙ্গীসাথিরা ভোরে উঠেই অযোধ্যা পাহাড়ে চলে যায়। সেখানের জঙ্গলে গাছের গোড়ায় গোড়ায় প্রচুর মাসরুম পাওয়া যায়। এইসব মাসরুমগুলোকে এই অঞ্চলের লোকেরা বলে ছাতি, যেমন -বালিছাতি, পুটকাছাতি, বন্ডাছাতি কাড়ানিছাতি ইত্যাদি। এইসব মাসরুম খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি খুব পুষ্টিকরও। ডাভা গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট শাখা নদী। বর্ষাকালে এই নদীতে এবং গ্রামের পুকুর এমনকি চাষের ক্ষেতগুলিতেও পাওয়া যায় ছোট বড় প্রচুর পরিমানে মাছ। আর গ্রামের ক্ষতে শাকসবজি তো আছেই।

যাক্, যেকথা বলছিলাম। গ্রামের পূর্বদিকে নির্ঝরের মামার একটি বড় পুকুর আছে। এই পুকুর থেকে মাছ বিক্রি করে মামাদের বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো আয় হত। তাছাড়া পুকুরের পাড়ের নীচে যে দুশো বিঘার মতন উর্বর জমি আছে তাতে প্রতিবছর প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। এই দুশো বিঘা জমিতে প্রায় প্রত্যেক গ্রামবাসীদের কিছু না কিছু জমি আছে। এই জমিতে নির্ঝরের মামাদের প্রায় কুড়ি বিঘা জমি আছে।

নির্ঝরের মামিমা ওকে প্রত্যক্ষভাবে চাষের কাজ না করালেও পরোক্ষে অনেক কাজ করান। যেমন ভোরবেলা উঠে কাজ করার পর ক্ষেতগুলো টহল দিয়ে আসা, পুকুরের পাড় দেখে আসা, গরুর গাড়িতে করে মামার সঙ্গে গিয়ে ক্ষেতে সার দেওয়া ইত্যাদি।

(৩)

নির্ঝরের মামা নির্ঝরের জন্য একটা ছিপ কিনে নিয়ে এসে বললেন, দেখতো নিঝু এটা কি এনেছি।

নিঝু বলল, মাছ ধরবার ছিপ। মামিমা পাশ থেকে বলে উঠলেন, নিঝুর শুধু মাছ ধরে বেড়ালেই হবে ?

মামিমার কথায় নিঝুর বুকটা দুঃখে ভরে উঠল। কিন্তু ছিপ পাওয়ার আনন্দে সেই দুঃখটাকে ভুলে গেল সে।

নিঝু কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল মাছ ধরতে। ভাবল রথ দেখা কলা বেচা অর্থাৎ মাছ ধরা আর ক্ষেত দেখভাল করা দুইই হবে। কিন্তু পুকুরের কাছাকাছি পৌঁছাতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

বৃষ্টি মাথায় করে পুকুরের পাড়ে গিয়েই সে দেখল পুকুরের পুবপাড়ে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। সেখান দিয়ে পুকুরের জল বেরোচ্ছে। সে বেশ বুঝতে পারল এই গর্তই বিশাল আকার ধারণ করবে এবং নিমেষে সমস্ত পাড় ভেঙ্গে পড়বে।

তাতে যেমন পুকুরের সমস্ত মাছ বেরিয়ে যাবে অন্যদিকে পুকুরের নীচের দুশো বিঘে জমির ধানচারাগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। নির্ঝর কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। তার হঠাৎ হান্স-এর অসম সাহসিকতার গল্পটা মনে পড়ল।

নির্ঝর তাড়াতাড়ি গর্তের কাছে ফিরে এল। কিন্তু এর মধ্যেই গর্তের আকার বেশ বড় হয়েছে। তাই এখন আর হান্সের মতো হাতের মুঠো গর্তে ঢুকিয়ে রাখার উপায় নেই।

কিন্তু কিছুই কি সম্ভব নয় ? নিঝুর চোখের সামনেই কি বাঁধ ভেঙ্গে যাবে ? নির্ঝর মা-কে স্মরণ করে গর্তে নেমে বুক পর্যন্ত নিজেকে ঢুবিয়ে দিল।প্রচন্ড শীত করছে তার।

(৪)

এদিকে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে। নিঝুকে না দেখতে পেয়ে মামা ভাবলেন সে হয়তো কোন বন্ধুর বাড়ি গেছে। রাত সাতটা বেজে গেলে মামার চিন্তা বাড়ল। নিঝুর বন্ধুদের বাড়িতে ওর খোঁজ না পাওয়ায় গোটা গ্রামে ওর খোঁজ শুরু হয়ে গেল।হঠাৎ মামিমার নজরে পড়ল নিঝুর ছিপটা নেই। মামিমা নিঝুর মামাকে বলল, ওর ছিপটা যে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা টর্চ, লন্ঠন, লাঠি নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে পুকুরের দিকে এগিয়ে চলল।

এদিকে নির্ঝরের শরীর তখন ঠান্ডায় অসাড় হয়ে এসেছে। সে অনুভব করছে আর কিছুক্ষণ পরেই সে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

গ্রামবাসীরা পুকুরের কাছে এসে নি-ঝু-ম বলে জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগল। নিঝু গ্রামের লোকেদের চিৎকার শুনতে পেল কিন্তু সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাটুকু যে তার নেই।

মামা সকলকে একত্রিত করে চারপাশটা ভালো করে খুঁজতে বললেন। হঠাৎ নিঝুর বন্ধু কানাই চর্টের আলোয় দেখল বাঁধের পাড়ের মধ্যে নিঝুর মাথা পোঁতা রয়েছে। সকলেই প্রথমে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে চমকে উঠল। সকলে মিলে নির্ঝরকে সেখান থেকে বের করে পুকুরের গর্ত বুজিয়ে দিল।

পরদিন গোটা গ্রাম নির্ঝরের বীরত্বের কথা জানতে পারল। সকলে জানতে পারল কিভাবে সে এক টা পুকুরের পাড় ভেঙে পড়ার হাত থেকে পুকুরের মাছ সহ প্রায় দুশো বিঘা ধানের জমিকে সে রক্ষা করেছে। নির্ঝরের মামিমা দিনরাত জেগে ওর সেবা করতে লাগল। নির্ঝরের জ্ঞান ফিরলে সে মা মা বলে ডাকতে লাগল। ওর মামিমা কাছেই ছিলেন, কান্নাভেজা চোখে তিনি নির্ঝরকে বুকে চেপে ধরলেন।

নিঝুর বাবা বাইরে ছিলেন। তিনি নির্ঝরের প্রতি সকলের ভালোবাসা দেখে আপ্লুত হয়ে গেলেন।

স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

গ্রামের বাড়ি চাঁদের বুড়ি

এই আকাশ বাতাস ডাক দিয়ে যায়
আয় যত খোকাখুকু ছুটে ছুটে আয়।
আম পাকলে নিবি ঝুড়িভরা মিঠে আম
জাম পাকলে খেতে পাবি মুঠোভরা জাম।
ধবলির দুধ দেব গরম ফেনা তুলে
বাটাপোনা তাও দেব পুকুরে জাল ফেলে।
ছুট মারবি মাঠে,ঝাঁপ দিবি খালে-পুকুরে
সাথে যাবে কানাই, ভয় আবার কি রে।
গাছে গাছে ফুল পাখি হরেক কিচিরমিচির
গ্রামের বাড়ি, চাঁদের বুড়ি বাউল এক ফকির।
এই নিয়ে বসত আমার দশ ঘরে থাকি
তোরা এলে মজা পাবি নেই তাতে ফাঁকি।

লালমোহন ভট্টাচার্য

ফুলের দেশে পরি

ফুলের দেশে নামল পরি ঘোমটা দিয়ে সাদা,
ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠে বলল দিদি-দাদা।
কোথায় ছিলে কোন সে দেশে, নামলে কেমন করে ?
সাদা পোশাক পরলে কেন ? মন যে কেমন করে।
এসো তোমায় সাজাবো আজ খোঁপায় রঙিন ফুল
পায়ে দেব কদম রেণু, মাথায় রেশম চুল।
জবা রং-এর আলতা দেব , ফুল চন্দন ভালে,
হাতের নখে শিমুল-পলাশ নয়নতারা গালে।

সুযশকান্তি দত্ত

অঞ্জলি

বিশ্বকবি নোবেল জয়ী জগৎ জোড়া নাম,
রবিঠাকুর দেশবাসীর আজকে নাও প্রণাম।
তোমার লেখা বাংলা গানে বইছে জোয়ার প্রাণে
তাইতো সাজাই তোমার আসন তোমারই জয়গানে।
ধূপদানীতে গন্ধ ধূপের গঙ্গাজলের শুদ্ধতা
প্রজ্জলিত প্রদীপ শিখা দেখি আমি মুগ্ধতা।
স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে জন্মদিনে বাজাই শাঁখ,
তোমার পায়ে অঞ্জলি দিই পুণ্য-প্রভাত পঁচিশ-বৈশাখ।

সোমনাথ ভট্টাচার্য
খেলবে নাকি

খেলবে নাকি কুমিরডাঙা
তোমরা আমার সাথে ?
মাঠঘাট নেই, তা-ও খেলা কি
কেউ পারে আটকাতে ?

ছাদটা ধরে নিলাম নদী,
খড়ির দাগে টানা
মধ্যে মধ্যে ওই দেখা যায়
ছুটকো ছাটকা ডাঙা। ?

কুমির হতে সাধলে আমায়
শিকার ধরার ছলে
ভুস্ করে ঠিক তুলব মাথা
খেলার নদী জলে।

জলের ধারে ভুলেও এলে
রক্ষা তো নেই কারও,
কুমির ছুঁলে পথ পাবে না
কোথাও পালাবারও।

কাউকে পেলেই নাগালে, ব্যস
আমার তবে ছুটি,
ছাদ-নদীতে নতুন কুমির
নামবে গুটি গুটি।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয়
ছোটদের পত্রিকা

সম্পাদকঃ অমল ত্রিবেদী
আদ্রা, ডাক-আদ্রা,
জেলা- পুরুলিয়া,৭২৩১২১

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত
আমার গ্রাম

গাঁয়ের একটি কোণে পদ্ম পুকুর
ফুটে আছে ছোট-বড় পদ্ম নানান,
সকালে ভ্রমর ঘোরে বাজিয়ে নূপুর
রাতের জ্যোৎস্না ভেঙে হয় খানখান।
খড়ে ছাওয়া পাঠশালা গ্রামের মাঝে
সেখানে প্রথমপাঠ স্বরবর্ণের
নামতার সুর কানে এখনও বাজে
আজও যেন ডাক শুনি গুরুমশায়ের।
ডাং-গুলি, ঘুড়ি হাতে ধুলো মেখে গায়
শৈশব এখানেই কেটেছে আমার
কত রকমের খেলা গাজন মেলায়
দেখেছি আবাক হয়ে হাত ধ'রে মার।
শৈশব কাটতেই শহরে এলাম
কতকথা মনে পড়ে ছেলেবেলাকার
বছর কেটেছে কত তবু সেই গ্রাম
প্রতি রাতে ফিরে আসে স্বপ্নে আমার।

শশাঙ্কশেখর মৃধা
ঐক্যমন্ত্র

আমরা সকলে ভারতবাসী
নানা জাতি নানা পরিধান
বিভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে মোরা
গাইবো জাতীয় সংগীত গান।
যে যাই পরি, যে ভাষায় কথা বলি
থাকে যেন ঐক্যের সুর,
জাতিভেদ কথা ভুলে গিয়ে
করে তুলি জীবন মধুর।
নানা জনের নানা খাদ্যসম্ভার
রুচিমতো তারা খায়,
বিভিন্নতার মধ্যে একতার বাণী
বিজ্ঞজন শিক্ষা দেয়।
আমরা সকলে ভারতবাসী
কখনো না যেন ভুলি,
ভারতমায়ের সন্তান রূপে
ঐক্যভারত গড়ে তুলি।

সুধারানি মৃধা
মেঘলা মেয়ে

মেঘলা মেয়ে মেঘের দেশে
যাচ্ছে মেঘের ভেলায়,
আঁচলখানি হাওয়ায় ওড়ে
মৃদুল হিমেল দোলায়।
ঢাল নেমেছে চুলের রাশি
মেলিয়ে মেঘের গায়,
মেঘের ভেলায় ভেসে সে
মেঘের দেশে যায়।
কালো সাদা মেঘগুলো সব
দিচ্ছে হাতছানি,
কি অপরূপ দেখতে সে যে
যেন মেঘের রানি।
ওর রূপেতে মুগ্ধ সবাই
ভুবন ভরা হাসি
আকাশ থেকে বৃষ্টি ধারা
ঝরছে রাশি রাশি।

পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
শারদ মাসে

বর্ষা বাদল বিদায় নিতেই
শরত ঋতুর দেখা,
একটা ছেলে দাঁড়িয়ে তখন
শিউলি তলায় একা।
বাপ মা হারা ওই ছেলেটা
কাঁদছে মায়ের তরে,
ঠিক তখনই শিউলি কিছু
পড়ল মাথায় ঝরে।
শিউলি বলে যা ভুলে তুই
এখন শরত কাল,
মায়ের জন্যে দুঃখ ভুলে
দেখো পুজোর সকাল।
শারদ মাসে মা হারানোর
সকল মনোক্লেশ
পাড়ায় ঘুরে ঠাকুর দেখে
হোক না ধুয়ে শেষ।

পঞ্চানন বসু মল্লিক

মামদো ভূতের একটা ছানা

মামদো ভূতের একটা ছানা,
সন্ধ্যে হলেই দেয় সে হানা।
কোথায় জানো ? নদীর ধারে,
ঝুপ্‌সি পানা বটের আড়ে।
কাউকে পেলে কায়দা করে,
অমনি তাকে জাপটে ধরে।
কালো ঝোলায় রাখে পুরে,
মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে।
রাতটা গভীর হলেই পরে
পাঠায় দূরে যমের ঘরে।

কাঞ্চনকুমার মুখোপাধ্যায়

জেগে ওঠো বাছারে

ঘন ঘোর আঁধারের
চাপ চাপ কালো,
ভেদ করে উঁকি মারে
ভোরের আলো।
ফিক্ করে হেসে ওঠে
ঝকমকে সূর্য,
টুক করে উঠে পড়ে
বাজিয়ে সে তূর্য।
ঝিকি মিকি ঘাসে ঘাসে
শিশিরের গন্ধ,
প্রজাপতি রং মেখে
ছড়ায় যে গন্ধ।
আলোমাখা দিঘি-জল
মাছেরাও নাচে রে,
মোরগ ঐ হাঁক ছাড়ে
জেগে ওঠো বাছারে।

অরুণ মন্ডল

অ-রামায়ণ

রামায়ণের কুঁজো বুড়ি
মেজো রানির দাসী,
তার কূট-বুদ্ধির গোপন কথা
জানতেন রামের মাসি।

রাতের বেলা শোবার আগে,
নস্যি নিতো নাকে,
সকাল হলেই দুষ্টু বুদ্ধি
মারত ঠেলা তাকে।

তাইতো সেদিন ঠেলা খেয়ে
বললে রানিমাকে,
ভরত খোকা রাজা হবে
বলে এসো রাজাকে।

সৌমিত্র মজুমদার

শরৎ এলো তাই

শরৎ এলো তাই তো গো আজ
মনটা আপনভোলা,
বুঝতে পারি হৃদ-কুঠুরী'র
সব দোরই যে খোলা।
কাশের বনেও হিল্লোল আর
শিউলি ঝরে ভোরে,
বলতে পারিস পাখির মতন
সবাই কেন ওড়ে।
আসল কথা, এই তো সময়
উৎসব যে দ্বারে,
মা আসছেন ধরার বুকে
তাইরে নাইরে নারে।
ঢ্যাং কুড়াকুড় কাইনানা-তে
উদাস বুকের খাঁচা,
সারা বছর সেই খুশিতেই
এই আমাদের বাঁচা।

সুদীপ্ত সরখেল (বাবাই)

ঠাকুরদার বাগানে

ঠাকুরদার বাগানে
হরেক রকম গাছ,
অর্জুন, শিরিষ, নিম, ছর্‌রা
পুকুর পাড়ে বাঁশ।
আছে করঞ্জ, শিমুল, শিশু
পলাশ একটাই,
কুল ও বেল ছাড়া
ফলের গাছ নাই।
সকাল বেলায় জেগে উঠি
শালিক, কোকিলের ডাকে,
রবির কিরণ এসে পড়ে
গাছের ফাঁকে ফাঁকে।
গাছে গাছে দোয়েল শ্যামা
বুলবুলি টুনটুনি,
চড়াই পাখির কিচির মিচির
ঘুঘুর ডাক শুনি।
লেজটি তুলে কাঠবিড়ালি
লাফায় গাছে গাছে,
দুপুর বেলায় তিতির পাখি
ডাকে ছায়ায় বসে।
মাঝে মাঝে ময়না, টিয়া
আসে বাগানেতে।
হুক্কা হুয়া শেয়াল ডাকে
পৌষ মাসের রাতে।

গৌর সেন

সঞ্চিতা

যাহা বাঁশ জানি কঞ্চিতা'
আমি শুধু পড়ি সঞ্চিতা।
সঞ্চিতা মানে নজরুল
নজরুল সেই ভীমরুল।
ইংরেজ তাঁরে দ্যায় জেল
তারপরে শেষ তার খেল।
সঞ্চিতা আনে সরখেল
যেন এক গাছ-পাকা বেল।
গল্প-ছড়ায় ভর্তি তা,
আমি শুধু বসে পড়ছি তা।

সত্যজিৎ দাস

দুগ্গা মাগো

ড্যাম কুড়া কুড় বাদ্যি বাজে
দুগ্গা আসে ঘরে,
আলপনা দে শঙ্খ বাজা
ফুল দে থালার 'পরে।
মন ভরানো রূপ যে মায়ের
দেখবি ছুটে আয়,
বাতাসেতে দুলছে কাশ
শিউলি ঝরে যায়।
সবার মনে রং লেগেছে
সব দেখি আজ ভালো
শরৎ মানে দুগ্গা পুজো
দাও মুছে মা কালো।

উদয়ন হাজরা

মা এসেছে

ঢাক বাজে, বাজে ঢোল,
চারিদিকে শোরগোল।
বাজে সানাই বাজে কাঁসি
সবার মুখে খুশির হাসি।
পুজো এসেছে, মা এসেছে
খুশির হাওয়া কাশে-ঘাসে।
ফুলগুলি দ্যাখ কেমন হাসে,
মুক্ত মেঘ নীল আকাশে।
খোকা-খুকি নতুন সাজে
মা-মাসিরা পুজোর কাজে।
কেউ বা নাচে, কেউ বা গায়,
আনন্দের আর সীমা নাই।
পুজো এসেছে মা এসেছে
আনন্দে তাই দেশ ভেসেছে।

কনক ঠাকুর

স্বপ্ন বিছানো সাঁকো

আকাশবাগানে যাওনি কখনো গেলে পাবে তারাফুল
তারাদের পাড়া ঘুরলেই তুমি আশমানি বুলবুল
আবার কখনো একতারা হাতে তুমি এক উদাসীন
কখনো আবার মেঘ-মেয়েদের নূপুরের রিনঝিন।

রামধনু থেকে সাত রং নিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখো
পার হয়ে যেয়ো ইচ্ছেনদীর স্বপ্ন বিছানো সাঁকো
অরুন্ধতী, স্বাতী ও শ্রবণা —সন্ধ্যায় ওরা ফোটে
চোখ ভ'রে দেখো কিভাবে তখন রাত্রিটা জেগে ওঠে।

নীলাদ্রিশেখর সরকার

শব্দখেলা

আমি কল্পনাতে ঠিক এঁকেছি লিখতে গিয়ে ভুল
আমি মাত্রা নিয়ে খেলতে গিয়ে হারিয়েছি মান কুল।
আমি দু'পঙতি পর থমকে দাঁড়াই হচ্ছে কী না ঠিক
আমি শব্দ কেটে শব্দ জুড়ি হারিয়ে দিগ্বিদিক।
আমি বিশেষণে লজ্জা ঢাকি আধুনিক দিই রূপ
আমি ছেদ-যতিতে মুক্তো ঝরাই পড়বে যে টাপুটুপ।
আমি ছন্দ ভাবতে নাম ভেবে নিই মন্দাক্রান্তাকেই
আমি উচ্চারণের লঘুগুরু পৃথকীকরণেই।
আমি যেথা কভু আর লিখি না ওসব ব্যাকডেটেড
আমি ছাঁকনি নিয়ে শব্দ ছেঁকে পঙক্তি করি সেট।

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

যাচ্ছে তাই নয়

সারাদিন লেখাপড়া, আঁকা, গান
খোকাটার তাই আজ পাচ্ছে হাই
যাচ্ছে তাই, যাচ্ছে তাই, যাচ্ছে তাই।
দাদু নেই, মাঠ নেই, নেই রান
মিস্ কাছে ছুটে ঘুম পাচ্ছে ভাই।
যাচ্ছে তাই, যাচ্ছে তাই, যাচ্ছে তাই।
বাবা মা'র সাথে বোন আর ভাই
জু-তে যায় ছুঁতে কত মজাটাই।
বুক ভরে যায় মজা সুখটাই
ব্যাপারটা নয় আর যাচ্ছে তাই।

কল্যাণ দাশগুপ্ত

ভুলভুলাইয়া

ভেবেছিলেন বাজার যাবেন
যবনগড়ের পবন দাস,
মনের ভুলে পার্কে ঢুকে
টেনে ছেঁড়েন সবুজ ঘাস।
আবার দেখুন ভোরবেলাতে
সুজনবাগের পুজন ঘোষ
সেলুন যেতে বেলুন কিনে
ঘরে ফিরে কি আপশোশ!
কান্ড দেখে বলব কি আর
শিয়ালদহের পিয়াল রায়
আটা ভুলে ঝাঁটা কিনে
ভাবল রোটি ক্যায়সে খায়!
সবজিপট্টি গেলেন রাতে
গোকুলডিহির নকুল সেন
কাঁচকলা নয়, কচু আনতেই
রণচন্ডী মিসেস সেন!
এই তো সেদিন বিকেলবেলায়
সোনারপুরের কোনার সাব
নারকেল হাতে বাড়ি ফেরেন
বউমা বলেন, এটা তো ভাব!
কাজের তাড়ায় মনের ভুলে
চিচিঙেও হয় ঝিঙে
ময়না কিনতে রাম ঠকেছি
খাঁচায় ভরে স্রেফ ফিঙে!

নীলাকাশ বসু

বোকা

এক যে আছে সম্পাদক
নামটি তার তরুণ,
গোবেচারা বোকা-সোকা
তাকিয়ে থাকে করুণ।
সরখেল সে হলেও তেমন
দেখায় না তো খেল,
উঠতে বসতে সব বিষয়ে
একেবারেই ফেল!

বিড়াল মহিলাদের পায়ে পায়ে ঘোরে কেন

সৈয়দ রেজাউল করিম

বিড়ালরা মহিলাদের পায়ে পায়ো ঘোরে কেন ?
যতীন দাদুর মুখে প্রশ্নটা শুনেই আমাদের জিভ শুকিয়ে উঠল। কারণ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাথা। একটু পরেই নানান ব্যাখ্যা হাজির করে দিল চোখের সামনে। মহিলারা আদর করে বিড়ালদের কাছে ডেকে নেয়। পুশি, লুসি, মম্পি প্রভৃতি কত আদর করে ডাকে। বিছানায় নিয়ে শোয় । উচ্ছিষ্ট খাবার বা দুধরুটি বানিয়ে খেতে দেয়। কখনো ছড়ি নিয়ে হেই হেই করে মারতে যায় না। এইসব নানা করণে মহিলাদের পছন্দ করে বিড়ালেরা। খাবার লোভে, আদরের লোভে, ভালো বিছানায় শোবার লোভে বিড়ালেরা মহিলাদের পায়ে পায়ে ঘোরে।
যতীন দাদু বলল - দক্ষিণ আফ্রিকার লোকজনেরা কি ভাবে জানিস ?
আমরা পড়া বলতে না পারা ছাত্রের মত নিরুত্তর।
যতীন দাদু বলল - ওদের লোককথায় এ সম্বন্ধে একটা ভালো গল্প আছে। গল্পের কথা শুনে আমরা বায়না ধরলাম, কি সেই গল্প ? আমাদের তা বলতে হবে।
যতীন দাদু বলল শোন তাহলে। বলে শুরু করল গল্প বলতে। সে অনেক বছর আগের কথা। সেসময় বেড়ালেরা বনে বাস করত। বাঘের মত চোখ, গোঁফ, গায়ে ডোরাকাটা দাগ থাকার জন্য বনের পশুরা তাদের বাঘের মাসি বলে ডাকত। কিন্তু বাঘের মত তাদের গায়ে কোন শক্তি ছিল না। এই শক্তি না থাকার জন্য হরহামেশা তাদের প্রাণ হারাতে হত।
কিভাবে তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারবে কি করলে তাদের আর প্রাণ হারাতে হবেনা এই সব নিয়ে একদিন একটা সভা হল তাদের। সভায় ঠিক হল - একজন শক্তিশালী প্রাণীর ছত্রছায়ায় তাদের থাকতে হবে। কিন্তু কে সেই শক্তিশালী প্রাণী তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হল। এক একজন এক একরকম কথা বলল। অবশেষে তারা একমত হল এ জঙ্গলে শক্তিশালী প্রাণী হল একটাই সে হল পশুরাজ সিংহ। তখন তারা সকলে পশুরাজ সিংহের স্মরণাপন্ন হল।
এইভাবে দিন যায় , মাস যায়, বছর যায়। একদিন ক্ষুদার তাড়নায় সেই সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা হাতি উপর। ইচ্ছে ছিল তাকে মেরে উদরপূর্তি করার। কিন্তু হাতিটা ছিল একটু বেপরোয়া। মনে তার ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। অবস্থা বুঝেই সে তার শুড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল সিংহের কোমর। তারপর সজোরে আছাড় মারল এক গাছে। এক আছাড়েই হাড়গোড় ভেঙে লুটিয়ে পড়ল গাছের তলায়। পালাবার আর অবস্থা ছিল না তার। অবস্থা দেখে রাজকীয় ভঙ্গীতে কয়েক কদম গিয়ে সিংহের মুখের উপর চাপিয়ে দিল থামের মত দুটো পা। মড়মড় করে সব হাড়গোড় ভেঙে গেল সিংহের। বুকের ধুকপুকুনিটা থেমে গেল একসময়।
ঘটনা দেখে বিড়ালের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয় আর কি। পশুরাজ সিংহের থেকেও কেউ যে শক্তিশালী হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না। গুটি গুটি পায়ে একটা বিড়াল এগিয়ে গেল হাতির কাছে। লিলিপুটের মত ছোট্ট একটা জন্তুকে দেখে হাতি শুধালো - তুমি আবার কে ?
—আজ্ঞে, আমি হলাম বাঘের মাসি। লোকে আমাকে বিড়াল বলে চেনে।
—তা বাবা, কেন এসেছো এখানে ? কি চাই তোমার ?
—আজ্ঞে, কিছুই চাওয়ার নেই আমার। কাব্য করে বিড়াল বলল – শুধু বাসনা মোর তব পদধুলি মাথায় নেবার।
হাতি বলল, কেন হেন বাসনা তব ?
বিড়াল সবকিছু বুঝিয়ে বলল হাতিকে।
হাতি বলল– আমি যে বলবান শক্তিশালী এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে থেকে তোমার কি লাভ ?
—লাভ আছে মহারাজ। আপনার ছত্রছায়ায় থাকলে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাব। অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাব। আনন্দ ফূর্তিতে দিন কাটাতে পারব।
হাতি বলল– বেশ, বেশ। তুমি আমার সঙ্গে থাক।
সেই থেকে হাতির পিছনে দিন কাটত বিড়ালের। আনন্দ ফূর্তিতে দিনগুলো কাটছিল বেশ। হঠাৎ একটা কান্ড ঘটে

গেল। কোথা থেকে একজন শিকারি এসে জঙ্গলে ঢুকল। একে তাকে দেখে গুলি ছুড়তে শুরু করল। সেই গুলির আঘাতে অনেক প্রাণী ধরাশায়ী হল। রাগে অন্ধের মতো ছুটে গেল হাতি। কিন্তু শিকারির কাছে পৌঁছবার আগেই দুমদুম করে দুটো আওয়াজ হল। আর তাতেই বিশালাকার হাতিটা দুম করে কলা গাছের মত পড়ে গেল। তার আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি থাকল না। রক্তে ভেসে গেল সারা শরীর। একসময় নিভে গেল তার জীবন দীপ।

বিড়ালের খুব অনুশোচনা হল। দুঃখে শোকে জর্জরিত হল তার দেহমন। এই নিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। শিকারির হাতের হাতিয়ারটা দেখে চিন্তায় পড়ে গেল সে। দুম করে আওয়াজ হল, একটু ধোঁয়া বের হল আর তাতেই শক্তিমান হাতিটা মরে গেল। জিনিসটা কি তা জানার ইচ্ছে হল বিড়ালের। গুটি গুটি পায়ে সে এগিয়ে গিয়ে শিকারিকে শুধালো - তোমার হাতে ওটা কি ?

—এর নাম বন্দুক। গম্ভীর গলায় জবাব দিলো শিকারি। সেই সাথে জিজ্ঞেস করল – তাতে তোমার কি ?

—তাতে আমার কিছু নয়। আসলে আমি একজন শক্তিশালী মানুষ খুঁজছি, যার ছত্রছায়ায় মাথা তুলে বেঁচে থাকতে পারব বনের বাঘ সিংহ হাতিদের মতো।

—আমাকে কি তোমার শক্তিশালী মনে হয় না ?—বিড়ালের চোখে চোখ রেখে শিকারী শুধালো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। বিড়াল উল্লসিত হয়ে জবাব দিল।

—তাহলে আর দেরি কেন। তুমি আমার সাথে চল, শিকারি বলল। বিড়াল পিছু নিল। একসময় তারা বনাঞ্চল ছেড়ে জনপদে এলো। এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শিকারি ব্যস্ততার সাথে দরজায় টোকা মারল। কিছু পরে ভিতর থেকে একজন মহিলা বার হয়ে এলো। শিকারির হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিল। জুতো জামা সব খুলে ফেল, বলে হুকুম করল। শিকার করা পাখিগুলো হাত থেকে নিয়ে নিল। স্নান করে ঘরে ঢুকবে বলে ধমকালো। আর সেই শক্তিমান শিকারি তার আদেশ উপদেশ সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। এসব দেখে বিড়াল তাজ্জব হয়ে গেল। সে ভাবল এই মহিলাই সব শক্তির আধার। তাই শিকারিকে ছেড়ে মহিলার পিছনে ঘুর ঘুর করতে শুরু করল।

এরপর অনেক যুগ কেটে গেছে। কিন্তু মহিলাদের পিছন ছাড়েনি বিড়াল। মহিলাদের পায়ে পায়ে এখনো তারা ঘোরে। মহিলারা তাদের আদর করে উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়ায়। মাছ মাংসের কাঁটা, হাড় ডেকে ডেকে দেয়। আদর করে বিছানায় শোওয়ায়। এমন শক্তিমান মাহিলাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে কেন তারা ?

অঙ্কের ভূত

তরুণকুমার সরখেল

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অবি সরকার

দাম ঃ ৫০ টাকা।

মজা রাশি-রাশি

ক্লাস সেভেনের মতিরামের অঙ্কে বড় ভয়। প্রায়ই তাকে হেনস্থা হতে হয় 'অঙ্কের জাহাজ' বিপদতারণস্যারের হাতে। একদিন মতি এমন বুদ্ধি বরে করল, যাতে সহজ করে অঙ্ক শেখানোর সংকল্প নিতে বাধ্য হলেন বিপদতারণস্যার। এদিকে ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানি শীতে মুচকুন্দপুর গ্রামে রুগি দেখতে গিয়ে ঠাকুরদা পড়লেন রকমারি ভূতের পাল্লায়। ছেলেধরা ভেবে বাঁশিবাজানো যাদুকরকে মেরে আধমরা করে দিল গ্রামের লোক। জুতো চুরি গেল ভূতোমামার। রহস্যের সমাধান হল সোনার কলমের। কথা বলা ময়না পাখির জন্য সুমনের মন খারাপ করল। এত সব ঘটনা নিয়েই তরুণকুমার সরখেল লিখে ফেললেন মজার একটি বই অঙ্কের ভূত।

আনন্দমেলা

২০ শে এপ্রিল ২০১৪

সঞ্চিতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

অমিয়কুমার সেনগুপ্তের

ছোটদের জন্য ছ'টি মনমাতানো ছড়াগ্রন্থ

মিষ্টি রোদের বিষ্টিতে / এই ছেলেটি

সবুজের মেলা / আমরা সবাই বন্ধু হব

হইচই / নীল আকাশে মেঘের দেশে

গবুর কাণ্ড

• কুমার হোড় চৌধুরী

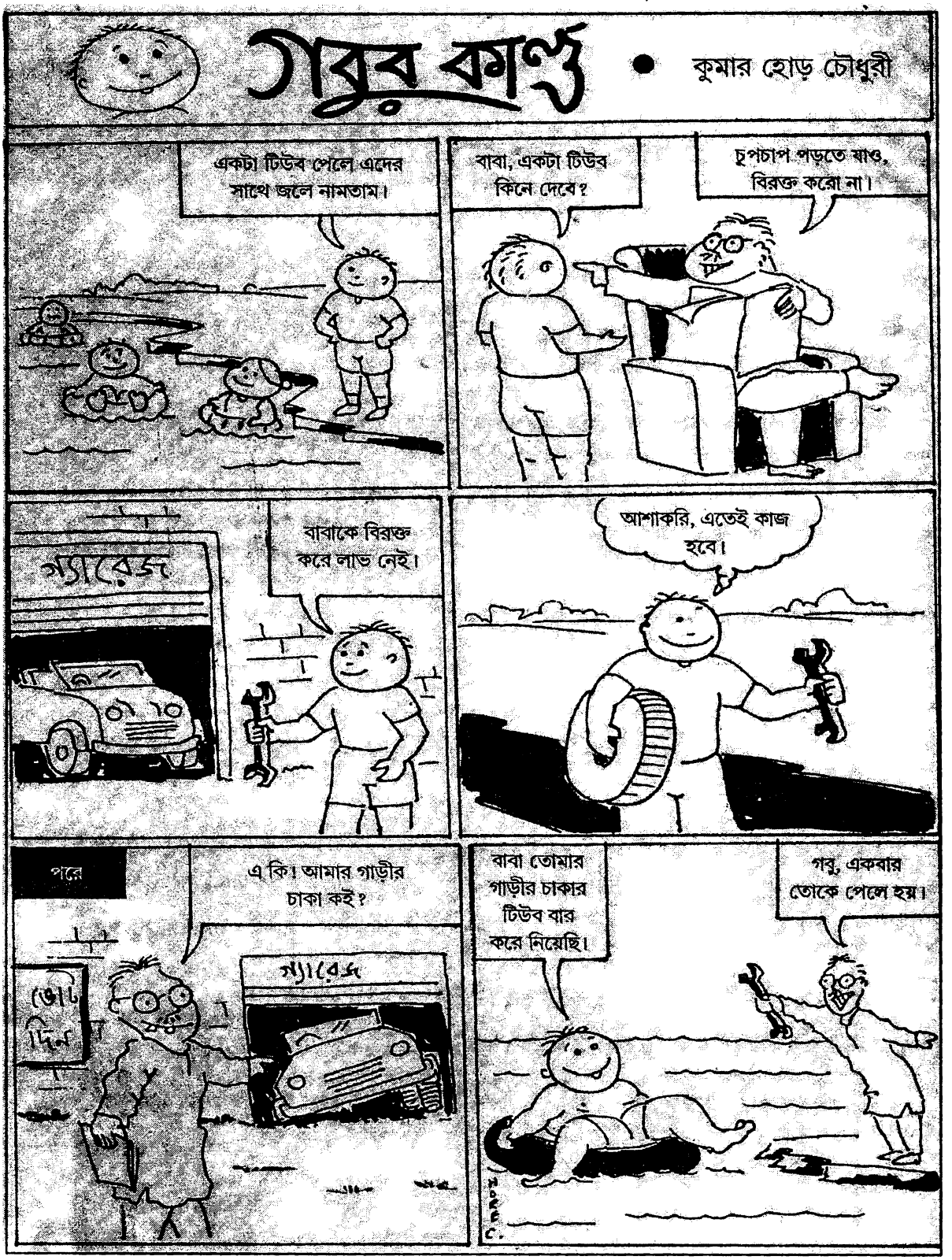

ছোটোদের ছড়া

সুনির্মল চক্রবর্তী

১ম খন্ড, ২য় খন্ড ও ৩য় খন্ড

সুনির্মল চক্রবর্তী ছোটোদের জন্য ছড়া-কবিতা লিখছেন চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। ইতিমধ্যেই ছড়া-কবিতার বই প্রকাশ পেয়েছে একুশটি। আশ্চর্য সুন্দর সেই সব বই বাংলা শিশুসাহিত্যের এক একটি উজ্জ্বল উপহার। বইয়ের পাতায় পাতায় অলংকরণ করেছেন বিখ্যাত সব চিত্রশিল্পীরা। ছড়া-কবিতায় পাই মনোহারী ভাষা, ছন্দ, মিল, সূক্ষ্ম রসবোধ, বিস্ময় ও কৌতূক, যা তিনি কত অনায়াসে অর্জন করেছেন! এতদিন পরে তাঁর ছড়া গ্রন্থগুলো দু-মলাটের নিশ্চিত আশ্রয়ে তিন খন্ডে প্রকাশিত করতে পেরে আমরা উল্লসিত - পুনশ্চ।

তিনটি খন্ডই প্রকাশ করেছে পুনশ্চ।

প্রথম খন্ড ৪০০ টাকা।

দ্বিতীয় খন্ড ৪০০ টাকা।

মা বললেন, ওরে অসুর, করিস লম্ফঝম্প ?
মাথার উপর বসেই আমার হচ্ছে ঝুড়িকম্প।
অসুর বলে, দুর্গাদেবী
মর্ত্যলোকে চলছে হেভি
যখন তখন -ভয়াল রকম-বেজায় ভূমিকম্প।

ছবিঃ প্রণব হোড়

তরুণকুমার সরখেল-এর কয়েকটি ছোটদের বই

- মজার মেরিক
- ভূতোমামার জুতো
- এক পকেট লিমেরিক
- মেজমামার ছাতা
- হাতি দাদার সাঁকো
- সাঁতরাগাছির সতুমামা
- ছড়ার ঢাক দিচ্ছে ডাক
- ভূতের ঘরে ভুতো
- আড়িয়াদহের পুড়িয়াবাবা
- লিমেরিক জিন্দাবাদ
- প্রজাপতির দেশে
- পুরুলিয়া মেরিক
- নীল ঘুড়ি
- ছত্রিশ মেরিক
- হলুদফুলের হাসি
- সোনারুপোর চাঁদ
- তাইরে নাইরে নাই
- উদভট্টম
- সেঞ্চুরি মেরিক
- ইচ্ছে করে
- তরুণের ছড়া
- ব্যাঙের পাঠশালা
- শিবু আংকেল
- এক পকেট ভূত
- লেজকাটা শেয়াল
- ছোটদের গল্প
- অঙ্কের ভূত
- একটি কিশোর একা
- ম্যাজিক ছাতা
- এক ডজন গল্প
- এক ডজন হাসির গল্প

ভূতেরাও ভালো হয়

তরুণকুমার সরখেল

সন্ধ্যে থেকেই লোডশেডিং বলে সাড়ে ন'টা বাজতে না বাজতেই পাড়াটা শুনশান হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাধাই ডাক্তার বাবুর চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, "এটাই উপযুক্ত সময়। আজ কথাটা ডাক্তার বাবুকে বলতেই হবে। তার মতো দয়ালু মানুষ এ তল্লাটে আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

মাধাই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজার বাঁ দিকে একটি পুরনো নেমপ্লেট ঝুলছে। তাতে লেখা ডাঃ বি বি সামন্ত অর্থাৎ বিপিনবিহারী সামন্ত। ডাঃ সামন্ত টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় একটা টুকরো কাগজের উপর আঁকিবুকি কাটায় ব্যস্ত ছিলেন। মাধাই সুড়ুৎ করে ঢুকে ডাক্তারবাবুর উলটো দিকে যেখানে রোগীরা এসে বসে সেখানে বসে পড়ল।

ডাঃ সামন্ত একবার চশমাটা নাকের ডগা থেকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে সামনের দিকে নজর আনলেন। কিন্তু মাধাইকে দেখেও তিনি দেখলেন না মনে হল।

মাধাই মনে মনে ভাবল, "এখন কি ডাক্তারবাবুকে বিরক্ত করা ঠিক হবে ? কিন্তু কোন রোগী চেম্বারে ঢুকে পড়লে সে তো কথাই বলতে পারবে না।"

মাধাই একবার ঘাড়টা অনেকখানি ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল ডাক্তারবাবু পেন দিয়ে কি লিখছেন। দূর থেকে মাধাই যা দেখতে পেল তাতে তার মনে হল ডাক্তারবাবু সাদা পৃষ্ঠায় বাচ্চা ছেলের মত একবার লিখছেন আর তারপরেই কেটে দিচ্ছেন।

মাধাই এবার একটু গলা খাকারি দিল। তারপর সাহস করে বলেই ফেলল, "ডাক্তারবাবু আমার একটা নিবেদন ছিল।"

কিন্তু তার গলাটা যথেষ্ট পরিস্কার শোনাল না। তবে ডাক্তারবাবু মাধাই এর উপস্থিতি টের পেলেন ঠিকই। তিনি খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, "কি রে মাধাই নাকি ? তা

বাবা জলে ভিজে ভিজে বেশ ঠান্ডা লাগিয়েছিস মনে হচ্ছে ? বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মাছ ধরার নেশাটা তোর গেলনা দেখছি। ঠিক আছে এই পাঁচটা পুড়িয়া তৈরি করে দিচ্ছি, খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তার আগে দেখ দেখি আমার এই বর্ষাকে নিয়ে লেখা কবিতাটা কেমন হল । এইমাত্র শেষ করলাম এটা। একেবারে টাটকা বলতে পারিস।"

মাধাই কবিতার নামে জড়সড় হয়ে বসল। আগে ডাক্তারবাবুর কবিতাটাই না হয় শোনা যাক, তরপর সে তার নিজের কথা বলবে।

ডাঃ সামন্ত বললেন, " বুঝলি মাধাই এখন কারো হাতেই সময় নেই। ঘোড়ায় সবাই জিন চাপিয়ে চেম্বারে আসে। কাউকে কবিতা শোনানোর কথা বললেই বলে, ডাক্তারবাবু আজ তাড়া আছে। অন্যদিন আপনার কবিতা শুনে যাবো। দিনে দিনে মানুষগুলোর হলটা কি বলত ? কবিতা কি খারাপ জিনিস ?"

মাধাই আবার কিছু একটা বলতে গেল কিন্তু ডাক্তারবাবু ততক্ষণে সদ্য লেখা বর্ষার কবিতাটা পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। " বৃষ্টি মানেই মানকচুটির পাতায়, পড়বে ঝরে হাজার হিরের কুচি/ বৃষ্টি মানেই ইলিশ ভাজার ঘ্রাণ, পেটটি পুরে আলুর দম আর লুচি।" ডাক্তারবাবু বেশ দরদ দিয়েই পড়ছিলেন। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ বলে উঠলেন, " ভালো কথা মনে পড়েছে। তোদের খালপাড়ের ওদিকটায় ট্যাংরা নামতে শুরু করেছে ?"

মাধাই এবার খানিকটা নড়েচড়ে বসল। বলল, "আইজ্ঞে ডাক্তারবাবু সেই দুঃখের কথাই তো বলতে এসেছি। গেঁদু বাবু আর জলা-টলা কিছু রাখবেন বলে মনে হয়না। গিয়ে দেখেন খাল-ডোব সব বুজিয়ে ফেলে কেমন ঝাঁ-চকচকে পেল্লাই পেল্লাই বাড়ি তুলে ফেলছেন। ট্যাংরা মাছ তো দূর অস্ত ওখানে আর চুনো-পুঁটিও পাবেন না। আমাদের পরিবারের যে ক'জন কাদা ঘেঁটে সংসার চালায় তারা পথে বসতে চলেছে। গেঁদু বাবু বলেছেন, ওখানে আরো উঁচু উঁচু বাড়ি উঠবে। আপনি যদি কিছু একটা ব্যবস্থা করেন কত্তা, তাহলে বেঁচে যাই। "

ডাক্তারবাবু তার সদ্য লেখা কবিতাটায় কাদাজলে ব্যাঙেদের গান-টান ইত্যাদি দিয়ে শেষ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে যে আর কাদা জলে ব্যাঙেদের গান শোনা যাবে না এটা ভেবেই তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তাই কবিতাটা আর পড়লেন না।

মাধাই হাতজোড় করে বলল, "ডাক্তারবাবু আপনার সাথে ভুমি-আপিসের বাবুদের তো বেশ চেনা-জানা আছে। তাদের বিষয়টা জানিয়ে যদি খালপাড়ের জলা-জমিটা বাঁচানো যায় তো পরিবার গুলো বেঁচে যায়।"

ডাক্তারবাবু খুব মন দিয়ে মাধাই এর কথাগুলো শুনলেন। বেচারা বলেছে ঠিকই। গেঁদুবাবুর থাবা একবার যেখানে পড়বে সেখানটায় আর সবুজ বলে কিছু থাকবে না। কংক্রিটের জঙ্গল বানিয়ে ছাড়বে। এই যে এখন বাইরে কি সুন্দর ইলসেগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এই সময়ই তো উপরের পুকুর থেকে খল খল করে জলের স্রোতে ট্যাংরার দল ভেসে এসে সারা মাঠময় ছড়িয়ে যায়। ডাঃ সামন্ত খুব ছোটবেলায় মাঠের জল ঘেঁটে ট্যাংরা মাছ ধরতে যেতন। কতবার ট্যাংরার কাঁটা ফুটে রক্তও বেরিয়েছে হাতে পায়ে। কাদা ঘেঁটে মাছ ধরার আনন্দই আলাদা।

তিনি মাধাইকে বললেন, "দিন দিন জন সংখ্যার চাপে শহর বেড়েই চলেছে। ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে জলা-জমি, সবুজ মাঠ সবকিছু।"

তারপর হঠাৎ ডাক্তারবাবু টান টান হয়ে মাধাইকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। হ্যাঁ, এ তো মাধাই ছাড়া অন্য কেউ নয়। তিনি এতক্ষণ কবিতা লেখায় এতটাই বুঁদ হয়েছিলেন যে মাধাই এর ব্যাপারটা তার মগজ পর্যন্ত ঢোকেই নি। আসল কথা হল মাধাই তো এখন আর মানুষ নেই। সে তো কবেই ইহলোক ত্যাগ করেছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "মাধাই তুই তো সেই কবেই মরে ভূত হয়ে গেছিস। তাহলে তুই কেন খামোখা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছিস ? নাকি তোরও থাকার জায়গায় টান পড়ছে ? সেই আগের নিরিবিলিটা আর পাচ্ছিস না, তাইতো ?"

মাধাই এবার হাত কচলে বলল, "আপনি ছাড়া গরিবের আর কে আছে বলুন ডাক্তারবাবু।

ভূত হয়েছি বলে আপনার উপকার কি ভুলে গেছি ?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "সে না হয় বুঝলাম যে তুই একজন গরিব ভূত, জলার ভূত, গেঁয়ো ভূত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যারা বেঁচে আছে, যাদের নাকের ডগায় জলা জমি ভরাট হয়ে কংক্রিট হচ্ছে তারা করছেটা কি ? তুই ভূত হয়ে যেটা বুঝতে পারছিস তারা বুঝতে পারছে না কেন ?"

মাধাই বলল, "মানুষ তো চিরটা কাল নিজেই নিজের ক্ষতি করে এসেছে কর্তা। সেটা আমি ভূত হয়ে বেশ বুঝতে পারছি। "

এমন সময় বাইরের দরজায় কেউ একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে পড়তেই মাধাই নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু সেই দিকে চেয়ে নিজের মনেই বললেন, "বেচারা মাধাই ভূত হয়েও ভালো চিন্তা করতে ছাড়লো না। শুধু বুদ্ধিমান মানুষগুলো কবে যে নিজের ভালোটা নিজে বুঝতে শিখবে কে জানে।"

ছোটদের বই

শনি-রবির গল্প

সম্পাদনাঃ সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ সিংহ
প্রকাশক ঃ **প্রিয়া বুক হাউস ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯।**
প্রচ্ছদ ঃ দেবাশিস সাহা ও অলংকরণ ঃ পার্থ মৈত্র।
মূল্য ঃ ২০০ টাকা।

বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতা থেকে নেওয়া (১৯৯৭-২০১৪) গল্পগুলি ছোটদের জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এই শনি-রবির গল্পে। মূলতঃ ঐ সব গল্পগুলি কোন এক শনিবার অথবা রবিবার প্রকাশিত হয়েছিল বলেই এই নাম। সংকলনে যাঁদের লেখা আছে তাঁরা হলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, অনিতা অগ্নিহোত্রী, উল্লাস মল্লিক, তিলোত্তমা মজুমদার, অনন্যা দাশ, সিদ্ধার্থ সিংহ প্রমুখ। খুব সম্ভবতঃ ছোটদের জন্য এটিই সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের শেষ সম্পাদিত গল্পের বই।

রং ছড়িয়ে যায়

সম্পাদনাঃ শুভজিৎ বরকন্দাজ
পানকৌড়ি, হৃদয়পুর কলকাতা- ১২৭।
প্রচ্ছদ ঃ শুভ্রনীল
মূল্য ঃ ১২০ টাকা।

রং ছড়িয়ে যায় ছোটদের জন্য একটি জমজমাট কবিতা সংকলন। প্রচ্ছদ ছবির মত এর পাতায় পাতায় রং ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সম্পাদক। গেট-আপ, প্রচ্ছদ, বাঁধাই, মুদ্রণ সব কিছুই উন্নতমানের। মূলতঃ সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বাছাই করে এই সংকলনের কবিতা ও ছড়াগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। লেখক তালিকায় আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সরল দে, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক ঘোষ, পবিত্র সরকার, শ্যামলকান্তি দাশ প্রমুখ।

মানভূম-পুরুলিয়ার ছড়া-সাহিত্য

সম্পাদনাঃ
অমিয়কুমার সেনগুপ্ত
প্রকাশক ঃ **সম্বোধি, কলকাতা**
মূল্য ঃ ২৫০ টাকা।

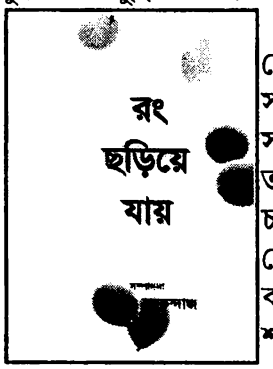

বইটির নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে এতে পুরুলিয়া জেলার ছড়া, ছড়াকার ও ছড়া পত্রিকা সমস্ত বিষয়ের উপর চমৎকার আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও গীতিকার শ্রী চিত্তভূষণ দাশগুপ্তকে। ছড়া শুরু হয়েছে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৪৩) কে দিয়ে আর শেষ হয়েছে কাজল দাস (১৯৯২-) দিয়ে। জেলার ছড়া পত্রিকা, ছড়াকারদের ছড়ার বই, এখানের ছেলে-ভুলানো ছড়া, ঘুম-পাড়ানি ছড়া, খেলাধুলোর ছড়া কোনকিছুই বাদ পড়েনি। এতে। ছড়াকারদের জন্য এটি একটি মূল্যবান হাত-বই।

গল্পগুলো পদ্যে লেখা

অবি সরকার
আবোল তাবোল প্রকাশনা, কলকাতা- ৮৪
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ অবি সরকার
মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

মোট এগারোটি ছড়া। কিন্তু প্রতিটি ছড়াই দীর্ঘ এবং বিষয় ভাবনায় আলাদা। বিষম কান্ড ছড়াটি পড়ে সত্যি সত্যিই বিষম খেতে হয়। ছড়াটির শুরু এই ভাবে *বিষম বিষাক্ত কিছু ছড়া লেখা দরকার/ভেবে তাই পুলকিত বুড়ো অবি সরকার* /বিষ নিয়ে এরকম ছড়া লিখতে আর কে করতে পেরেছে এ যাবৎ ?

ভালো লাগল সিধো-কানো ডহরে, এমনটা তো হতেই পারে, শিশুর কেন পিলে, আসল কথা। তবে গল্পগুলো পদ্যে লেখার সবচেয়ে জমজমটা ছড়াটি বোধহয় ভূত চলেছে শতশত। ছড়ার সঙ্গে মানানসই অলংকরণ বইটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। প্রচ্ছদ ভাবনাও প্রশংসনীয়।

ছোটদের বই

কেতুমামার কীর্তি

মুকুল মাইতি
প্রকাশক ঃ শেফালি মাইতি
২২৫, শ্রীরামপুর (নর্থ)
গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
অবি সরকার
মূল্য ঃ ৮০ টাকা।

কেতুমামার কীর্তিতে রয়েছে মোট চৌদ্দটি গল্প। প্রতিটি গল্পই শিশু-কিশোর উপযোগী। মুকুলবাবু এর আগেও অনেকগুলি বই ছোটদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু মজার কথা হল তাঁর প্রতিটি গল্পের বইয়ের মজাগুলো আলাদা আলাদা। ছোটদের জন্য তিনি লেখার এত উপাদান পান কেমন করে ? এটাই আমাদের অবাক লাগে। আলোচ্য গল্প গুলির মধ্যে অভিনব দারোগাবাবু, বাদশা ফিরে এল, কেরী দাদুর কেরামতী, যিশু দারোগার কথা ভালো লাগল। পাতায় পাতায় অলংকরণগুলি ছোটদের সহজেই মন জয় করে নেবে। প্রচ্ছদটিও মানানসই।

ভালো ভূত মন্দ ভূত

মুকুল মাইতি
সুব্রত ভট্টাচার্য
প্রকাশক ঃ শেফালি মাইতি
২২৫, শ্রীরামপুর (নর্থ)
গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
অবি সরকার
মূল্য ঃ ১০০ টাকা।

ভালো ভূত মন্দ ভূত একটি চমৎকার ভাবনা। দশটি গল্প শ্রী মাইতি ও দশটি গল্প শ্রী ভট্টাচার্য লিখেছেন। কুড়িটি জমজমাট ভূতের দাপাদাপিতে বইটি ছোটদের কাছে দারুণ লোভনীয় হবে। রেল ভূতের খপ্পরে, ঝড়বাদলের মেছোভূত, ভূত কাহিনি, খেয়াঘাটের ভূত, মন্টু এসেছিল, তাহলে কি পাঁচির ঠাকুমাই, রহস্যময় বাড়ি, তেনাদের কথা খুব ভালো লাগল। অবি সরকারের অলংকরণগুলি মনমাতানো। সঙ্গে প্রণব হোড়ের দু'টি অলংকরণও চোখে পড়ল।

সবুজ ঘোড়া

পার্থ সিন্‌হা
ছোটদের কচিপাতা
৩৪, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।
প্রচ্ছদ ঃ অঞ্জন বসু।
অলংকরণ ঃ পার্থ মৈত্র।
মূল্য ঃ ৮০ টাকা।

মোট বাহান্নটি নিঁখুত ছন্দের ঠাস বুননে বোনা পার্থ সিন্‌হার এই ছড়ার বইটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বোধহয় প্রচ্ছদের

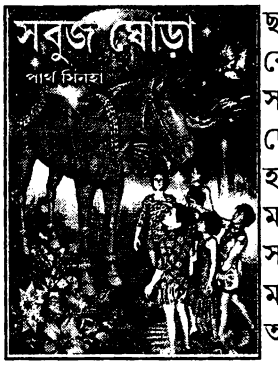

ছবিটি। ভেতরের ছড়াগুলি কোনটি ছেড়ে কোনটা পড়ি। সব কয়টি ছড়াই প্রথম শ্রেণির ছোটদের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। শপিং মল, ইচ্ছে মাতাল, সাতখানা ভূত,ছুট, সবুজের মেলা বিশেষ ভাবে মনে দাগ কাটল। পার্থ মৈত্রের অলংকরণগুলি প্রশংসনীয়।

পাতার বাঁশি

সোমনাথ ভট্টাচার্য
রূপসী বাংলা
সুমুদ্রণ, ৫২৮, এম বি রোড, কলকাতা ৫১।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ দীপঙ্কর দে।
মূল্য ঃ ৫০ টাকা।

পাতার বাঁশি নামটি অভিনব। ছোটবেলায় তালপাতা দিয়ে বানানো বাঁশি বাজিয়ে আমরা বড়দের কানের পোকা মেরে দিয়েছি। সেই পাতার বাঁশি বইটিতে শ্রী ভট্টাচার্য উপহার দিয়েছেন ষাটখানা ছড়া ও কবিতা। একটি ছড়ার চারটি লাইন

না উল্লেখ করে পারলাম না, *কচুকাটা সেপাই নামে/সাতটা গাঁয়ে তাকে/ হাসতে হাসতে দিব্যি লোকে/চিনত একডাকে।* ছড়ার নাম কচুকাটা সেপাই। এরকমই হরেক ছড়া ছড়িয়ে রয়েছে পাতার বাঁশির পাতায় পাতায়। প্রচ্ছদ নজর কেড়ে নেয়।

MOBILE : 9475324474, 8670037151

BABALOKENATH COMPUTER & OFFSET PRINTING MATH

All types of Offset Printings & Multi Colour Job done here.

Prof. Rajesh Rawani

MUNICIPALITY COMPLEX, ROOM NO. A-13, 1ST FLOOR
B.T. SARKAR ROAD, PURULIA